ছোটদের
আলী মিয়া র.

সংকলন

রাবেয়া বিনতে সালমান

(34) بچوں کے علی میاںؒ   از سید ابوالحسن علی ندویؒ

تالیف: رابعہ بنت سلمان

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ছোটদের আলী মিয়া
সংকলনে ঃ রাবেয়া বিনতে সালমান

প্রকাশ কাল
অগ্রায়হণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
মহররম, ১৪৩৪ হিজরী
ডিসেম্বর, ২০১২ ঈশায়ী

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ 02-712-11221; মোবাঃ 01822-806163

কম্পিউটার কম্পোজ
মারজিয়া কম্পিউটারস্‌
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-90178-9-9

মুল্য ঃ ১২০.০০ (একশত কুড়ি) টাকা মাত্র।

NUTUN PRITHIBIR JANMO DIBOSH: BIRTH DAY OF NEW WORLD. Written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, translated by Abdur Razzak Nadvi, published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Phone; 712 1121. Printed by M/S Tawakkal Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000; Bangladesh.

E-mail: roufster@gmail.com Web site: www.muhammadbrothers.com

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.-এর বিশিষ্ট খলিফা, মাদরাসা দারুর রাশাদের প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেবের

দু'আ ও অভিব্যক্তি

জীবনে বড় হতে হলে বড় বড় মনীষীদের জীবনী পড়ার বিকল্প কিছু নেই। বড়দের জীবন সাধনা, জাতির জন্য তাদের ত্যাগ এবং কুরবানীর ইতিহাস পড়লে শিশু-কিশোরদের দেলের আয়নায় ওই সব মহাপুরুষদের পূত-পবিত্র জীবনের আলোকচিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ছোটরা তখন খুঁজে পায় বড় হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুদূরপ্রসারী নির্দেশিকা। বস্তুত যুগে যুগে যারাই বড় হয়েছেন, যারাই দেশ এবং জাতিকে কিছু উপহার দিয়েছেন তারা কোনো না কোনো বড় ব্যক্তিত্বকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছেন। 'ছোটদের আলী মিয়া নদভী' গ্রন্থটিও এ দেশের শিশু-কিশোরদের জীবন গড়ার এক অতি উজ্জ্বল নমুনা হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.–একটি জীবন, একটি ইতিহাস। তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর একজন প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী। তিনি তাঁর বিদুষী মা সাইয়িদা খায়রুননিসা এবং বিজ্ঞ বড় ভাই ডা. আব্দুল আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে এক বিশেষ পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে এবং বড় বড় মনীষীদের সাহচর্য লাভ করে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ হতভাগ্য উম্মতের জন্য একটি ব্যথাতুর অন্তর দান করেছিলেন। মাওলানা আলী মিয়া র. জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, জ্বালাময়ী বক্তৃতা, দরস-তাদরীস এবং দাওয়াত ও তাবলীগসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণের চেষ্টা করেছেন। হযরতের ওপর বড়দের জন্য বাংলা ভাষায় দু'একটি জীবনীগ্রন্থ পাওয়া গেলেও ছোটদের জন্য আমার জানামতে এটিই প্রথম প্রয়াস।

আশা করি 'ছোটদের আলী মিয়া নদভী' বইটি পড়ে আমাদের শিশু-কিশোররা তাদের জীবন গড়ার অনেক পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবে।

বইটির লেখিকা আলেমা রাবেয়া ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তার কচি হাতের লেখা 'ছোটদের আলী মিয়া নদভী'র পাণ্ডুলিপি আমার হাতে পৌঁছলে খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাই। ছোটদের জন্য আমারই পীর ও মুর্শিদের জীবনী সংকলন করা হচ্ছে দেখে আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর আদায় করি। আমার স্নেহের মেয়ে রাবেয়া এবং তার জামাতা তরুণ লেখক ও অনুবাদক মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনীসহ এ গ্রন্থখানির প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। দু'আ করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দেশের শিশু-কিশোরদের হযরত আলী মিয়া নদভী র.-এর মতো বড় আলেম হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

মাদরাসা দারুর রাশাদ
২৪.০২.০৯

নিবেদক
মুহাম্মাদ সালমান

প্রকাশকের কথা

একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ দাঈয়ে ইসলাম আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র. একটি নাম, একটি বিপ্লব, একটি প্রতিষ্ঠান ও একটি সংস্কারের নাম। তিনি ছিলেন একবিংশ শতাব্দীর পতনোম্মুখ মুসলিম উম্মাহর একজন পথনির্দেশক, উম্মাহর জন্য নিবেদিত একটি ব্যথাতুর দিলের অধিকারী, খাঁটি বুযুর্গ। আধ্যাত্মিকতায় যেমন ছিলেন একজন উঁচু মার্গের ব্যক্তিত্ব ঠিক তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়ে ছিলেন যোগ্য, প্রাজ্ঞ ও সজাগ দৃষ্টির অধিকারী। প্রায় সকল গুণের সমষ্টি তার মত সমসাময়িক অন্য কারো মধ্যে দেখা যায় না, তার দর্শন ছিল ইসলামকে গোটা বিশ্বের সামনে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা, সকল ষড়যন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলা করা। এ বিশ্ববিশ্রুত মনীষা গোটা জাতির জন্য একজন আদর্শ পুরুষ। ছোট-বড় সকলের জন্য। কীভাবে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, কাদের আঙ্গিনায় ছোট থেকে বড় হলেন, কাদের কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছেন, কেমন ছিল তার পিতামাতা, ভাইবোন। এ সকল তথ্য আমাদের জন্য জানা আবশ্যক।

তার জীবনচরিত আমার নজরে পড়েছে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তার জীবনী পাঠ করে। তার সকল কিতাবের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করি। কিন্তু একটি শূন্যতা বিরাজ করছিল আর তা হল আমাদের কচি-কাঁচাদের সামনে আলী মিয়াকে উপস্থাপন করা। তাহলেই ওরা আদর্শবান হতে পারবে। এ ইচ্ছাটুকু লালন করে আসছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে মাসিক মুক্ত আওয়াজে ছোটদের পাতায় ছোটদের আলী মিয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে দেখে কৌতূহলী হই। কে সে আলী মিয়া, সবক'টি সংখ্যা পড়ে বুঝতে আর বাকী রইল না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি লিখেছেন

হযরত আলী মিয়া র. এর বিশিষ্ট খলীফা, মাদরাসা দারুর রাশাদের প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান -এর মেয়ে রাবেয়া বিনতে সালমান। অত্যন্ত চমৎকার লিখেছেন। আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি তার স্বামী হুসাইনী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে তা বই আকারে বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি রাজী হয়ে যান। কম্পোজ ও সম্পাদনা করে আমার হাতে তুলে দেন। এ গ্রন্থটি আমি আজ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুপ্রিয় পাঠক! বইটি ছোটদের জন্য লিখা হলেও এটি একটি নাতিদীর্ঘ সর্বাঙ্গীণ জীবনীগ্রন্থ হয়েছে। আমরা আশা করি সকলেই এর দ্বারা সমানভাবে উপকৃত হবেন। আমরা নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

১০.০৩.০৯ খৃ.

প্রকাশক

মনের ডায়েরী থেকে

১৯৯৪ এর কথা। আমি তখন ছয় বছরের ছোট্ট মেয়ে। আম্মুর কাছে শুনলাম মাদরাসায় একজন মেহমান আসছেন। মাদরাসায় সাজ-সাজ রব। "কে এই মেহমান" জানতে চাইলে আম্মু বললেন, তোমার আব্বুর পীর সাহেব। আব্বুর পীর! পীর কী জিনিস? আম্মু বললেন, আসলেই দেখতে পাবে।

তার কিছুক্ষণ পরই তিনি আসলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বয়ান করলেন। স্থাপন করলেন মাদরাসা দারুর রাশাদের একটি নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর। আব্বু আমাদের নিয়ে গেলেন দেখা করাতে। সাথে ছিল আমার ছোট ভাই। তিনি দু'আ দিলেন আমাদের। সেদিন খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম তাকে। এই অবুঝ মেয়েটির মাথায় সেদিন লেগেছিল তার পুণ্যময় হাতের পরশ। কেমন দেখেছিলাম তাকে, আজ আর তেমন কিছু মনে নেই। তবে আব্বুর পীরের সাথে দেখা করতে পেরে তখন ভালই লেগেছিল এক নিষ্পাপ মনে।

তিনি আর কেউ নন, তিনি একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী র.। ধীরে ধীরে বড় হয়েছি, আব্বুর মুখে তার নাম শুনেছি বারবার। আব্বু প্রায়ই আলী মিয়ার কথা বলে আমাদের উপদেশ দিতেন। সে সময় থেকেই এই মানুষটির সাথে পরিচিত আমি এবং আমাদের সকলেই। আব্বুকে প্রায়ই দেখেছি তার কাছে যেতে, পীর সাহেবের লেখা বই-পুস্তক এনে সযত্নে সাজাতে, আমরাও সাজাতাম। বলতেন, আলী মিয়ার বইগুলো এক জায়গায় রাখ। বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতাম। লেখকের প্রতি শিশুসুলভ শ্রদ্ধা জেগে উঠত। উর্দু বই পড়তে না পেরে আফসোস হত, ভাবতাম হয়ত বড় হলে একদিন পড়তে পারব। পরে বাস্তবিকই সেই সৌভাগ্য হয়েছে। তার উর্দু এবং বাংলায় অনূদিত বইগুলো পড়ে মনে হল সত্যিই তার দরদমাখা ভালবাসা, তার হৃদয়ের তপ্ত ব্যথা আর আবেগ ঠিকরে পড়ছে তার লিখনী থেকে।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯, শুক্রবার। জুমার নামাযের পূর্বে সূরা ইয়াসীনের একটি আয়াত فبشره بمغفرة واجر كريم তেলাওয়াতরত অবস্থায় আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়ে অগণিত মানুষকে কাঁদিয়ে এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। সেদিন আব্বুকে দেখেছি অঝোরে কাঁদছেন, যেন পিতৃবিয়োগের শোকে মূহ্যমান তাঁর এক স্নেহাস্পদ অবুঝ সন্তান।

তার লিখনী পড়ে এবং আব্বুর মুখে তার কথা শুনে অজান্তেই একসময় আমি তার ভক্ত হয়ে যাই। আরো বেড়ে যায় তার সম্পর্কে জানার স্পৃহা।

তাকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, স্মারক ইত্যাদি আব্বু মাঝে মধ্যেই বাসায় আনতেন। এগুলো পড়ে তাকে জানার চেষ্টা করি এবং টুকিটাকি বিষয় ডায়েরীতে নোট করি। এরপর ২০০২ সালে আব্বু তার একটি জীবনী গ্রন্থ 'আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র. জীবন ও কর্ম' প্রকাশ করেন। এই বইটি পড়ে হযরতের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সক্ষম হই। এরপর বারবার পড়তে থাকি। পড়ি এখনো। এর থেকে কিছু বিষয় সংগ্রহ করি।

অবশেষে আমার জীবনসঙ্গী মাওলানা শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী আমার এ সংগ্রহ দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং তিনি আলী মিয়ার উপর কিছু লিখার পরামর্শ দেন। আমি বললাম, এত বড় একজন মহান ব্যক্তিত্ব! তার সম্পর্কে আমি কী লিখব? তিনি বললেন, আব্বুর বইটিকে সামনে রেখে ছোটদের জন্য তার একটি জীবনী লিখ, আমি সহযোগিতা করব। তিনি আমাকে সহযোগিতা করলেন। হযরতের লেখা আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' থেকে আমাকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দেন। আমি লিখতে শুরু করি। প্রধান সম্বল হিসেবে সামনে রাখি আব্বুর প্রকাশিত উপরিউক্ত বইটি। হযরতের জীবনী থেকে প্রথমে আমি সূচীপত্র সাজাই। এরপর দীর্ঘ দু'বছর লেখা থেমে থাকে। আমার জীবনসঙ্গী বললেন, 'তুমি লিখছ না কেন? তুমি লিখে যাও। তোমার লেখা মাসিক মুক্ত আওয়াজে ছোটদের পাতায় ছাপা হবে। আমি আগ্রহ নিয়ে পুনরায় লিখতে শুরু করি। বারটি সংখ্যায় তা নিয়মিত ছাপা হয়। আমার লেখা দেখে অনেকেই আমাকে উৎসাহ দেন। বিশেষতঃ জনাব আবদুর রউফ সাহেব পত্রিকায় লেখা দেখে আমার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তা বই আকারে ছাপানোর

ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একদিন আমার স্বামীর অনূদিত বই 'কারওয়ানে মদীনা' ছাপা হয়। এর সাথে দেখি 'ছোটদের আলী মিয়া' নামে একটি বইয়ের কভার। খুব সুন্দর। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। তিনি আমাকে বললেন, খুব তাড়াতাড়ি ছোটদের আলী মিয়া লেখা শেষ কর। তোমার বইয়ের কভার ছাপা হয়ে গেছে। আমি আগ্রহ নিয়ে লেখা চালিয়ে যাই। এক সময় লেখা শেষ হয়।

মূলতঃ লিখতে গিয়ে হযরতের সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জেনেছি। হযরতের আখলাক, চরিত্র, চাল-চলন, কথা; এককথায় হযরতের গোটা জীবনটাই ছিল খুব সাজানো-গোছানো। তিনি ছিলেন উম্মাহর রাহবার ও কাণ্ডারী। আজ তিনি নেই। কিন্তু রয়ে গেছে অনেক মূল্যবান সম্পদ। তার জীবনটাই একটি বিশাল সম্পদ। বিশেষ করে তার ছোটবেলায় মায়ের শাসন ও দু'আ এবং বড় ভাইয়ের যে তারবিয়াতের মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, তা আজ আমাদের শিশুদের জন্য বড় মূল্যবান সম্পদ।

কিন্তু এতে তার সে বিশাল জীবনীখানি লেখা হয়েছে খুব ছোট্ট পরিসরে। যদিও ছোটদের জন্য লিখা, তবে এতে আলী মিয়ার জীবনের সবক'টি দিকই উঠে এসেছে। ফলে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী হিসেবে সবারই উপকারে আসবে সমানভাবে। আশা করি বইটি পড়ে আমাদের শিশু-কিশোররাও হতে পারবে আলী মিয়ার স্বার্থক উত্তরসূরী। আব্বু বইয়ের একটি ভূমিকা লিখেছেন, বইটি সম্পাদনা করেছেন আমার স্বামী। আর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন জনাব আবদুর রউফ সাহেব। আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ ও দু'আপ্রার্থী। মুনাজাত করি মহান রাব্বুল আলামীন যেন এই বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। আর আলী মিয়া র. কে দান করুন বেহেশতের উচ্চ মাকাম। সেই সাথে আমাদের সন্তানদের আলী মিয়ার পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আমীন।

বিনীত

১০.০৩.০৯ ঈসায়ী — রাবেয়া বিনতে সালমান

সূচীপত্র

১. জন্ম বংশ ও শিক্ষা

বংশ পরিচয় ১৭
তাকিয়া কেলা ১৯
জন্ম ২০
নূরের সন্ধানে ২১
কুরআনের প্রতি ভালবাসা ২৩
শিক্ষা জীবনের গতিধারা ২৬
তাফসীর অধ্যয়ন ২৭
সীরাতুন্নবী সা. ও আলী মিয়া ৩০

২. শৈশবকাল

শৈশবের দিনগুলো ৩২
বড় ভাই হলে এমনই হয়ো ৩৩
এমন মা আর কোথায় ক'জন! ৩৫
সে চিঠির দাম দিবে কিসে? ৩৬
লেখালেখিতে হাতেখড়ি ৩৯
এই বর্ণাঢ্য জীবনের পেছনে...! ৪০

৩. কেমন ছিলেন আলী মিয়া

দৈহিক গঠন ও পোশাক ৪১
দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দ ৪২
দুশ্চিন্তার মুহূর্ত ৪২
পছন্দনীয় খাবার ৪২
হাস্য-কৌতুক ৪২

৪. কর্মজীবন

মানুষ গড়ার কারিগর ৪৪
আরবী শিক্ষার অভিনব কৌশল ৪৬
শুভ পরিণয় ৪৮

৫. আধ্যাত্মিকতা

অনন্য এক জীবন ৪৯
প্রথম সাক্ষাত ৫০
দ্বিতীয় সাক্ষাত ও প্রথম বাই'আত ৫১
ইজাযাত ও খেলাফত ৫১
মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী র. -এর সন্ধান ৫২
প্রথম সাক্ষাৎ ৫২
রায়পুরের খানকা ৫৩
মুর্শিদের অন্তরে আলী মিয়ার স্থান ৫৩
হযরত থানভী র. -এর সংস্পর্শে ৫৪
আল্লাহর যিকির ও মুজাহাদা ৫৪

৬. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী

রাসূলের ভালবাসা ৫৬
আত্মগৌরব ৫৭
বাই'আত ৫৮
উম্মতের দরদে আলী মিয়া ৫৮
উদার মানসিকতা ৫৮
কারো মনে কষ্ট না দেওয়া ৫৯
নম্রতা ৫৯
মেহমানদারী ৬০
কুরআনের প্রতি ভালবাসা ৬০
নামায ও জামাআতের যত্ন ৬০
গরীবের সেবায় আলী মিয়া ৬১
পরিচ্ছন্নতা ও অনাড়ম্বরতা ৬২
আত্মভোলা মহামানব ৬২

৭. দাওয়াত ও তাবলীগ

তাবলীগী জামাআতের সাথে আলী মিয়ার সম্পর্ক ৬৪
লাখনৌতে দাওয়াতী কাজের সূচনা ৬৫
ছাত্রদের চরিত্র গঠনে তাবলীগী মেহনত ৬৬
লাখনৌতে হযরতজী ৬৬

ধন্য হল রায়বেরেলী ৬৭
হযরতজীর কাছের মানুষ ৬৭
দারুল উলূম ছেড়ে তাবলীগে ৬৮
ব্যথাতুর আলী মিয়া ৬৮
লাখনৌর জমীনে তাবলীগের নূরানী আলোকচ্ছটা ৬৯
হিজাযের সফর ৬৯
ঘুরে এলেন আরব ভূমি ৭০

৮. পীর ও মুর্শিদ আলী মিয়া র.

মুরীদের প্রতি আলী মিয়া ৭১
সালেকীনদের তারবিয়ত ও মা'মুলাত ৭৩
দৈনন্দিন কর্মসূচী ৭৪
রমযান মাস ও আলী মিয়া ৭৫
রমযানের কর্মসূচী ৭৬

৯. সংগঠক আলী মিয়া র.

দ্বীনী মাদরাসা ৭৮
রাবেতায়ে আদবে ইসলামী ৭৯
শিবলী একাডেমী ৭৯
রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ৮০
মানবতার পয়গাম ৮১
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ৮২

১০. দ্বিতীয় ইবনে বতুতা

সৌদী আরব ৮৪
মিশর ৮৫
সুদান ৮৫
দামেস্ক ৮৬
লেবানন ৮৬
তুরস্ক ৮৬
বাগদাদ ৮৭
পাকিস্তান ৮৭
রেঙ্গুন ৮৮

কুয়েত ৮৮
শ্রীলংকা ৮৮
বাংলাদেশ ৮৮
মালয়েশিয়া ৮৯
উজবেকিস্তান ৮৯
ইউরোপ ৯০
আমেরিকা ৯১
মক্কা শরীফ ৯৩

১১. হৃদয়ের আয়নায় আলী মিয়া

থানবী র. এর দৃষ্টিতে আলী মিয়া ৯৪
আব্দুল কাদের রায়পুরী র. -এর চোখে আলী মিয়া ৯৫
শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. ৯৫
আল্লামা ইকবাল র. -এর ভাষায় ৯৬
আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী র. ৯৬
শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী র. এর ভাষায় ৯৬
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী র. ৯৭
হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী র. ৯৭
হযরত আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী র. ৯৭
মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী র. ৯৮
মাওলানা শাহ ওসিউল্লাহ ইলাহাবাদী র. ৯৮
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ ফুলপুরী র. ৯৮
হযরত মাওলানা ক্বারী সিদ্দীক আহমাদ বান্দবী র. ৯৯
আরেফ বিল্লাহ ডাক্তার আব্দুল হাই র. ৯৯
জাস্টিস মাওলানা তাকী উসমানী দা.বা. ৯৯

১২. আলী মিয়ার মুখ নিসৃত বাণীসমূহ

কুরআন থেকে সবার শিক্ষা গ্রহণ ১০০
আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ১০১
সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা ১০১
আল্লাহওয়ালাদের প্রভাব ও বরকত ১০২
তাসাওউফ কী? ১০২
তাওয়াক্কুল ১০২

শিশুদের প্রতি আলী মিয়া ১০২
বড় ও ছোট রোযা ১০৩
যদি না থাকে এই মাদরাসা-মক্তব........ ১০৩
অপূর্ব শান্তি বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতে ১০৩
সবচেয়ে বড় উপকার........ ১০৪
একাল-সেকাল........ ১০৪
এই ব্যক্তিত্বের পেছনে........ ১০৪
আজকালের মানুষ........ ১০৪
কেন এই সামাজিক অনিষ্টতা?........ ১০৪
বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের একাত্মতা........ ১০৫
ইখলাস ও খাঁটি নিয়ত বৃথা যায় না ১০৫
কুসংস্কার দূর করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ১০৫
বেতনবিহীন শিক্ষাদান ১০৬
নেক দৃষ্টির প্রভাব........ ১০৬
মা'মুলাতের পাবন্দী করা ১০৬
কিছু দায়িত্ব........ ১০৬
জীবন যাপনের ধরন........ ১০৭
পবিত্র হিজাযের সঙ্গে হৃদ্যতা........ ১০৭
নিজের দোষ আর অন্যের গুণ দেখা........ ১০৮
যিকিরের প্রভাব সৃষ্টি করার তরীকা........ ১০৮
বিনয়, অনুগ্রহ ও ইখলাস বুযুর্গদের বৈশিষ্ট্য ১০৮
প্রবাদতুল্য সুন্নাতের অনুসারী ১০৮
কথা কম বলতে উৎসাহ প্রদান ১০৯
চারটি গুণের প্রয়োজনীয়তা ১০৯
মুসলমানের সম্পর্ক........ ১০৯
দ্বীনের দাওয়াত ১১০

১৩. রচনাবলী

লেখক আলী মিয়া ১১১
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ১১২
প্রিয় গ্রন্থ ১১২
একটি ঘটনা ১১৩

স্মরণীয় একটি ঘটনা ১১৩
একটি বই ১১৪
শিশু সাহিত্য রচনায় আলী মিয়া র. ১১৫
কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফাল রচনা ১১৫

১৪. পুরস্কার

শাহ ফয়সাল এওয়ার্ড ১১৮
কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির সম্মানজনক ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রী ১২০
দুবাই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার ১২১
প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের পুরস্কার ১২২

১৫. বিবিধ

নদওয়াতুল উলামা কী ও কেন? ১২৪
নদওয়াতুল উলামা ও আলী মিয়া ১২৭
বাইতুল্লাহর পথে আলী মিয়া ১৩৩
কাবা শরীফের চাবি আলী মিয়ার হাতে ১৩৪
বাংলাদেশে আলী মিয়া ১৩৬
ধন্য যারা লুটিয়ে চরণে তার ১৩৭
একটি চিঠি ১৩৯

১৬. ইন্তেকাল

আলী মিয়ার শেষ দিনগুলো ১৪০
অন্তিম যাত্রাপথে ১৪২

১৭. আলী মিয়ার বক্তৃতা থেকে

দ্বীনী মাদরাসার পরিচয় ১৪৫
সমাজের সঠিক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা ১৪৭
আরেকটি ভাষণ ১৫০
দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী ১৫২
মাদরাসা শিক্ষা সমাপনকারীদের উদ্দেশ্যে ১৫৫
প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে ১৫৯

১

জন্ম বংশ ও শিক্ষা

বংশ পরিচয়

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষের কথা। তখনো এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়ায়নি পুরোপুরিভাবে। মানুষেরা লিপ্ত গাছ-মাছ আর পাথর-মাটির মত হাজারো সৃষ্টির পূজায়। কুফর-শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত গোটা দেশ। চারদিকে অন্যায়-অবিচার, জুলুম নির্যাতন চলছে অবিরত। ঠেকানোর যেন কেউ নেই।

আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। তিনি আলো ছড়াতে চান। মানুষগুলোকে টেনে আনতে চান সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে আলোর ফোয়ারায়। জুলুম-অত্যাচার থেকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার দীপ্ত পথে।

হযরত আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ মাদানী এ সময়ের পুণ্যধন্য একটি নাম। অনেক উচ্চস্তরের বুযুর্গ। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী র. এর ভাগ্নে। তিনিই তাকে শিক্ষা-দীক্ষা

দিয়েছেন। আমীর কুতুবউদ্দীন একদিন খেলাফত লাভে ধন্য হন আপন মামার ইন্তেকালের পর তারই সুযোগ্য খলীফা শাইখ নাজমুদ্দীন কুবরা র. -এর কাছ থেকে।

একদিন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। স্বপ্নে দেখলেন, মুহাম্মাদ সা. তাকে বলছেন, তুমি ভারতবর্ষে চলে যাও। মানুষকে ডাক আল্লাহর পথে। সত্য ও ন্যায়ের পথে। সহসা ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভেতরটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়। মানুষের দরদে ও দীন প্রচারের চেতনায় অস্থির-চঞ্চল মনপ্রাণ। এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে সুদূর ভারতবর্ষে। আপন মুরীদদের নির্দেশ দিলেন, প্রস্তুত হও ভারতবর্ষে দীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে। মুহূর্তেই সহস্রাধিক মুরিদ তৈরী হয়ে গেল।

চলে এলেন তিনি বাগদাদ থেকে ভারতে। দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন। স্থায়ীনিবাস গড়ে তুললেন ভারতের কড়ামানিকপুরে। এখানেই তাঁর বংশধারা বিস্তৃত হতে থাকে। যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন অনেক মুজাহিদ ও মুবাল্লিগ। যারা মুসলিম উম্মাহর ইলমী ও দীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। বুদ্ধিদীপ্ত ও সংস্কারমূলক কাজের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন যুগ যুগ ধরে।

এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছেন সাইয়িদ শাহ আলামুল্লাহ র., মুজাহিদে আযম সাইয়িদ আহমদ শহীদ র. এবং উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র.। যারা বংশ পরম্পরায় হযরত আলী রা. -এর সন্তান। তাঁর বংশানুক্রম নিম্নরূপ-

মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী ইবনে মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই ইবনে ফখরুদ্দীন ইবনে আবদুল আলী ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকবর শাহ ইবনে মুহাম্মাদ শাহ ইবনে মুহাম্মাদ তাকী ইবনে আবদুর রহীম ইবনে হিদায়াতুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম ইবনে কাযী আহমদ ইবনে কাযী মাহমুদ ইবনে কাযী আলাউদ্দীন ইবনে আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ সানী ইবনে সদরুদ্দীন ইবনে যয়নুদ্দীন ইবনে আহমাদ ইবনে আলী ইবনে কিয়ামুদ্দীন ইবনে সদরুদ্দীন ইবনে রুকনুদ্দীন ইবনে আমীর নিযামুদ্দীন ইবনে শায়খুল ইসলাম আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে রশীদুদ্দীন আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ঈসা ইবনে হাসান ইবনে আবুল হাসান আলী ইবনে আবু যাফর ইবনে কাসেম ইবনে আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল আওয়ার আল জাওয়াদ নাকীবুল কুফা

ইবনে মুহাম্মাদ সানী ইবনে আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল আশতার ইবনে মুহাম্মাদ সাহিবুন নাফসিয যাকিয়্যা ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহয ইবনে হাসান মুসান্না ইবনে হাসান মুজতাবা রা. ইবনে আলী মুরতাযা রা.।

তাকিয়া কেলা

একটি প্রসিদ্ধ শহর। নাম তার রায়বেরেলী। মাইল দেড়েক দূর দিয়ে বয়ে চলেছে সাই নদী। আয়তনে খুবই ছোট। তবে বর্ষাকালে ভরা যৌবনা এ নদী হয় দেখার মত। তার খরস্রোত প্লাবিত করে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। আর গ্রীষ্মকালে তার তীরে হাওয়া খেতে ছুটে আসে ছোট-বড় সবাই। এর কূল ঘেষেই অবস্থিত ঐতিহাসিক তাকিয়া কেলা।

আলেম, জ্ঞানসাধক, সমাজ সংস্কারকের পুণ্যস্মৃতিধন্য এ শহর। এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন শত শত মহামনীষী। যারা একত্ববাদের দাওয়াত, আধ্যাত্মিক সাধনা, সমাজ সংস্কার, তালীম-তাবলীগ, রাসূলের সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিত ও আল্লাহর কালাম সমুন্নত করার মহান ব্রত পালন করে শুধু ভারতবর্ষে নয়, জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। এখানে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন হযরত সাইয়িদ আদম বিন নূরী র. -এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত শাহ আলামুল্লাহ হাসানী র.। তিনি ১০৫০ হিজরীতে মক্কা-মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে নাসিরাবাদ থেকে রায়বেরেলী আসেন। জনৈক বুযুর্গ তাকে পরামর্শ দেন হিজরত না করার জন্য। তিনি বুযুর্গের পরামর্শে নিজের ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। এরপর সাই নদীর তীরে খোলা মাঠে একটি ছাপরা ঘর ও একটি মাটির মসজিদ নির্মাণ করেন। লোহানীপুরের জমাদ্দার দৌলত খান তাকে দশ বিঘা জমি দান করেন। এ স্থানই কালক্রমে দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ বা তাকিয়া কেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুজাহিদে আযম সাইয়িদ আহমদ শহীদ র.। তিনি লালিত-পালিত হন এখানেই। এখানে রয়েছে ঐতিহাসিক সেই মসজিদ, যা ১০৮৩ হিজরীতে শাহ আলামুল্লাহ র. নির্মাণ করেছিলেন। বরকতের উদ্দেশে তিনি জমজমের পানি দিয়েছিলেন মসজিদের ভিত্তিতে। দেখতে প্রায় বাইতুল্লাহ শরীফের মত। কেবল মিনার ও মিম্বার ব্যতিক্রম। আর উচ্চতা বাইতুল্লাহর সম্মানে তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি কম। এটি একই সাথে ছিল খানকা এবং মাদরাসা। এখানেই চলত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র. -এর ইংরেজ ও শিখবিরোধী জিহাদের প্রশিক্ষণ। পরবর্তীকালে এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন আলী মিয়া নদভী র.।

জন্ম

আলী মিয়ার পিতা সাইয়িদ আব্দুল হাই র. এর প্রথম স্ত্রী ১৯০১ সালে ইন্তেকাল করেন। তার দ্বিতীয় বিবাহের জন্য সাইয়িদ যিয়াউন নবী র. এর কন্যা সাইয়িদা খাইরুননিসা এর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। দু'টি পরিবার সাইয়িদ বংশের দু'টি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলী মিয়ার বাবার সংসার ছিল অস্বচ্ছল। সহায়-সম্পত্তি বলতে কিছু ছিল না। পারিবারিক সূত্রে কিছু কিতাবাদী ছিল তার অমূল্য সম্পদ। আলী মিয়ার বাবা নদওয়ার নাযিম হিসেবে মাত্র চল্লিশ টাকা বেতন পেতেন। তাও এক সময় ছেড়ে দেন। ফলে তার পরিবারে নেমে আসে আর্থিক দৈন্যতা। অনাহার, উপবাস ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। তবে আলী মিয়ার নানার সংসার ছিল সচ্ছল ও অভিজাত। সঙ্গত কারণেই আলী মিয়ার নানী বিয়ের সে প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছিলেন না। কিন্তু আলী মিয়ার নানা সাইয়িদ যিয়াউন নবী ছিলেন ভিন্ন ধরনের মানুষ। তিনি আলী মিয়ার পিতার আচার-আচরণ, ইলমী ও রূহানী উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ভাল করেই জানতেন। তাই চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই রাজি হয়ে যান তিনি। দারিদ্র-ধনাঢ্যতার কোন মূল্য ছিল না তার কাছে। এরপর সাইয়িদ যিয়াউন নবী র. তার আদরের দুলালী সাইয়িদা খাইরুননিসাকে সাইয়িদ আবদুল হাই র. -এর হাতে সোপর্দ করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩২২ হিজরীতে এ শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

অভাব-অনটনের মধ্যেই তাদের দিন চলতে থাকে। পরবর্তীতে বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শে তিনি লাখনৌতে ফার্মেসী খোলেন। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আয়। এর মাঝেই দু'বোন সাইয়িদা আমাতুল আযীয ও সাইয়িদা আমাতুল্লাহ আয়েশার পর ১৯১৪ ইং মোতাবেক ১৩৩৩ হিজরীতে আলী মিয়া নদভীর জন্ম হয়।

বাবা সাইয়িদ আব্দুল হাই র. ছিলেন সুবিজ্ঞ হাকীম, ফিকাহ ও ইতিহাস শাস্ত্রের পণ্ডিতপ্রবর ও অভিজাত শ্রেণীর আলেম। তাঁর চরিত্র মাধুরী ছিল ঈর্ষাপূর্ণ। তিনি লেখালেখিতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গদ্যে ছিল তাঁর বিশেষ দখল। উর্দু ও আরবীতে ছিলেন সমান পারদর্শী। নুযহাতুল খাওয়াতির তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আলী মিয়ার আম্মা সাইয়িদা খাইরুননিসা ছিলেন এক মহীয়সী ও বুদ্ধিমতী নারী। সেই সঙ্গে একজন স্বভাব কবি ও কুরআনে হাফেযা। দু'আ-ইস্তিগফার এবং যিকির-আযকার ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক আমল। তাঁর

দাদা হাকীম সাইয়্যিদ ফখরুদ্দীন র. ছিলেন একজন সাহেবে নিসবত ও আল্লাহওয়ালাদের সোহবতপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

নূরের সন্ধানে

লাখনৌর আমিনাবাদ মহল্লার বাজারে ঝাউলাল মসজিদ। মসজিদের নিকটেই একটি মক্তব। পাশেই আলী মিয়ার আব্বার বাসা ও ফার্মেসী। ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন সে মক্তবে। শুরু হল তাঁর ইলমে ওহী অর্জনের প্রাথমিক সাধনা। শিশু আলী মিয়া নিয়মতান্ত্রিকভাবে মক্তবে আসা-যাওয়া করছেন। বাবার বড় আশা তাঁর ছেলে হবে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের উত্তরসূরী। আলী মিয়া উর্দু পড়েন চাচা আযীযুর রহমান নদভী ও মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ নদভীর কাছে। ফার্সী পড়েন মৌলভী মাহমুদ আলীর কাছে। দেখতে দেখতে শিশু আলী মিয়া পা রাখলেন নয় বছরে। ছেলের লেখাপড়ায় মনোযোগ দেখে বাবার খুশির অন্ত রইল না। বুক ভরে গেল খুশিতে। আনন্দে নেচে উঠল মন। বোধ হয় আলী মিয়াকে নিয়ে দেখা বহু দিনের স্বপ্ন পূর্ণ হতে চলেছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আলী মিয়ার আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাঁর অসুস্থতা। আশঙ্কা হল হয়ত ডাক দিয়েছেন এ জীবনের মালিক। কেঁদে উঠল তাঁর মন। দুনিয়ার ভালোবাসায় নয়, আলী মিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে। উদ্বিগ্ন তিনি। আবার আপনা আপনি আশ্বস্ত হলেন মহামহীমের করুণার দিকে চেয়ে। প্রাণ খুলে দু'আ করলেন ছেলের জন্য।

২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯২৩ খৃস্টাব্দের আলী মিয়াকে এতিম করে আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন তিনি। আলী মিয়া তাঁর মায়ের সাথে চলে আসলেন তাকিয়া কেলায়। পিতার অবর্তমানে সংসারের হাল ধরলেন আলী মিয়ার বড় ভাই ডাক্তার সাইয়্যিদ আবদুল আলী। তিনি ফার্মেসী খুললেন। তারপর নিয়ে এলেন আলী মিয়াকে। আপন কাঁধে তুলে নিলেন ছোট ভাইয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব। পিতার স্বপ্ন যে তাকেই পূরণ করতে হবে। চলল ছোট ভাইকে নিয়ে বড় ভাইয়ের অবিরাম সংগ্রাম। আলী মিয়া উর্দু ভাষা শিক্ষায় আবার মনোনিবেশ করলেন। এক সময় তিনি ফার্সী ভাষায়ও বিরাট দক্ষতা অর্জন করেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে ফার্সী ভাষা-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ছিল আবশ্যকীয়। কিন্তু বিচক্ষণ বড় ভাই সাইয়্যিদ আবদুল আলী বুঝতে

পেরেছিলেন, ভারতে ফার্সীর যুগ শেষ হতে চলেছে। শুরু হচ্ছে আরবী ও ইংরেজী ভাষার যুগ। তাই তিনি ভাইয়ের ফার্সী শিক্ষার পরিধি আর বাড়ালেন না। আরবী ও ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিলেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে তিনি আরবী শিক্ষার জন্য আলী মিয়াকে আরবী ভাষার অসাধারণ পণ্ডিত শাইখ খলীলের হাতে সমর্পণ করেন। অপরদিকে তার জন্য ইংরেজী শিক্ষকও নিয়োগ করেন। আলী মিয়ার আরবী ও ইংরেজী শিক্ষা একসাথে চলতে থাকে। তবে ইংরেজীর প্রতি গুরুত্ব ছিল তুলনামূলক কম। শাইখ খলীল আরব নিজস্ব সিলেবাস ও শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠ দিতেন। মাত্র তিন বছরে আরবী ভাষার যাবতীয় আনুষাঙ্গিক বিষয়সহ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী আয়ত্ব করে নেন আলী মিয়া। সুযোগ্য উস্তাদের তত্ত্বাবধানে আরবী ভাষার সাথে গড়ে ওঠে তার এক গভীর সম্পর্ক। এ সময় লাখনৌ জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ায় তাফসীরের উস্তাদ খাজা আবদুল হাই ফারুকীর কাছে কয়েকটি সূরার তাফসীরও পড়েন তিনি। তাছাড়া রায়বেরেলীতে অবস্থানের সময় পিতৃব্য মাওলানা তালহার নিকট নাহু-সরফে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

১৯২৭ খৃস্টাব্দে মাত্র ১৪ বছর বয়সে লোহানী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। অল্প দিনেই সেখান থেকে ফাযেলে আদব সনদ লাভ করেন। চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্তির জন্য ঘোষিত হন। কিন্তু সে সময় ইউনিভার্সিটির ফান্ড অপর্যাপ্ত হওয়ায় তাঁকে সে পদক দেওয়া হয়নি।

আরবী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর ফিকাহ নিয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শাইখুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেবের দরসে হাদীসের নিয়মিত ছাত্র হন। তাঁর নিকট দু'বছর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও বায়যাবী শরীফ পড়েন। মানতেকের দু'একটি কিতাবও পড়েন। শাইখুল হাদীস সাহেব ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের একজন বুযুর্গ এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী র.-এর বিশেষ খলীফা। তিনি আলী মিয়াকে খুব স্নেহ করতেন। ফলে দু'বছর শিক্ষাদান শেষে নিজ হাতে লিখে আলী মিয়াকে হাদীসের সনদ প্রদান করেন।

অপর দিকে আরবী সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ দারুল উলূম নদওয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক মাওলানা তাকীউদ্দীন হেলালের খেদমতে থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণতা অর্জন করেন আলী মিয়া।

এক সময় তিনি ইংরেজী শিক্ষার দিকেও ঝুঁকে পড়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ইংরেজী সাহিত্য চর্চায় ডুবে থাকতেন। কিন্তু তার মায়ের অনিচ্ছার কারণে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ছেড়ে দেন। তারপরও এক সময় ইংরেজী ভাষায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা দিয়েই তিনি সারা জীবন প্রয়োজনীয় ইংরেজীর কাজ চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৩০ ও ১৯৩১ খৃস্টাব্দে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর নিকট তাফসীর শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাও পড়েন। ১৯৩২ ঈসায়ী শাইখুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী র.-এর নিকট হাদীসের দরস নেওয়ার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সাথে সাথে শাইখুল আদব মাওলানা ইজাজ আলী র. -এর নিকট ফিকহের দরস নেন। দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে লাহোরী র.–এর দু'মাসব্যাপী তাফসীরুল কুরআন কোর্সে ভর্তি হন। চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাদরাসা কাসেমুল উলূমে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। মাওলানা মাদানী র. প্রধান অতিথি থেকে নিজ হাতে সনদ বিতরণ করেন। এভাবেই আলী মিয়ার শিক্ষা জীবনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

কুরআনের প্রতি ভালবাসা

হযরত আলী মিয়া র. বলেন, 'পবিত্র কুরআন পাঠের মধ্য দিয়েই আমার শিক্ষা জীবনের শুরু হয়। আমার লেখায় কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে এমন এক উস্তাদের নিকট পড়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন, যিনি ছিলেন ঈমান ও কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব। তিনি কুরআন পড়তেন আর অঝোরে কাঁদতেন। সর্বপ্রথম তিনি আমাকে যে তেলাওয়াত শুনিয়েছেন, তা ছিল কেবলই আবেগময়। আমার বড় সৌভাগ্য যে, আমার জীবনের প্রথম শিক্ষকই ছিলেন বিনম্র ও কোমল চিত্তের। আমার প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম আন্ত রিকতা। তিনি হচ্ছেন শাইখ খলীল আরাবী।'

হযরত আলী মিয়া 'আমার কুরআন অধ্যয়ন' নামে একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি বাল্যকালে মুসলিম সমাজে প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী নাযেরা কুরআন শরীফ পড়ি। কুরআন শরীফ পাকা হয়ে গেলে যথারীতি তেলাওয়াত করতে থাকি। কিন্তু বড়দের শত তাগাদা সত্ত্বেও তার উপর দৃঢ়পদ থাকতে পারিনি। আমার আরবী

শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হলে এবং অল্প-স্বল্প আরবী বুঝতে শিখলে কুরআন পাকের আয়াতসমূহ কিছু কিছু অনুধাবন করতেও শিখি।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ খলীল ইবনে মুহাম্মাদ আরাবী র. -এর কুরআনের প্রতি ছিল দারুণ আগ্রহ। সেকালে আমাদের মসজিদেই তিনি অধিকাংশ সময় ফজরের নামায পড়তেন। তার বংশ পরম্পরা আরবের ঐ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত, যাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের কাছে ইয়ামানবাসী এসেছে। তারা নরম দিল, কোমল অন্তরের অধিকারী।" হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সেই কোমলতা ও আবেগের একটি বিরাট অংশ দিয়েছিলেন। তিনি কুরআন তেলাওয়াতের সময় ব্যাকুল হয়ে পড়তেন এবং কেমন যেন হয়ে যেতেন। অজান্তেই চোখ থেকে বয়ে যেত অশ্রুধারা। তার সত্তা ছিল আবেগে ভরপুর। বড়ই করুণ আওয়াজ ও আবেগাপ্লুত ছিল তার তেলাওয়াত। আমার আজও খুব ভাল করে স্মরণ আছে, শেষ দিকের পারাগুলো থেকে ফজরের নামাযে একটি বড় সূরা দিয়ে আরম্ভ করতেন। কিরাআতের মধ্যে কান্না তাকে সূরা শেষ করতে দিত না। সূরা শেষ করার সুযোগ তার খুব কম এসেছে। থেকে যেত শ্রোতাদের হাজারো আফসোস। কেননা তারা বঞ্চিত হতেন এক মধুর কিরাআত থেকে।

আমার কুরআন শিক্ষার শুভ সূচনা তার কাছেই হয়েছে। শাইখের কাছে তাওহীদের বিষয়টির খুব প্রাধান্য ছিল। তিনি নিজে যেমন পরিচ্ছন্ন আকীদার অধিকারী ছিলেন, তেমনি স্বীয় ছাত্রদেরও সেই আকীদা বজায় রাখার ব্যাপারে জোর দিতেন। এটি আল্লাহর মহান অনুগ্রহ আর ইহসান যে, তিনি এমন শুদ্ধ আকীদার অধিকারী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নের সুযোগ দিয়েছিলেন।

সূরা যুমার, যা আকীদা ও তাওহীদ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি পরিস্কার ও জোরালো শিক্ষা দেয়, সেই সূরা যুমার ছিল তার একান্ত প্রিয় ও নির্বাচিত সূরা। আরবী সম্পর্কে আমরা যখন কিছু বুঝতে শুরু করি, তখন এই সূরা দিয়েই তিনি আমাদের পড়ানো শুরু করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে সূরা মুমিন ও সূরা শূয়ারা পড়ান। হযরত আরাবী সাহেব র. -এর স্বনির্বাচিত কিছু প্রিয় রুকু ছিল, যা তিনি অত্যন্ত আবেগ-আগ্রহ নিয়ে পড়াতেন। তার মধ্যে সূরা আলে-ইমরানের শেষ রুকু ছিল অন্যতম। এই রুকু সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম সা. শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হলে নামায পড়ার আগেই এ রুকু পড়ে নিতেন।

এমনিভাবে সূরা ফুরকানের শেষ রুকুও ছিল তার সেই নির্বাচিত রুকুগুলোর মধ্যে অন্যতম। আজও কানের পর্দায় ধ্বনিত হয় তার শ্রুতিমধুর আবেগমিশ্রিত কণ্ঠ। আরাবী সাহেব র. -এর মুখে এই রুকু শুনতে শুনতে আমার ভালভাবে হৃদয়াঙ্গম হয়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে কুরআন মজীদের সাথে গড়ে উঠে আমার এক অন্যরকম সম্পর্ক।

আরবী সাহিত্যের আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা যখন আমার সমাপ্ত হল, তখন কুরআন পাক তেলাওয়াত করে আমি অন্তঃস্থ এক আত্মার সন্ধান পাই। আমার পরিবারে তখন এমন কিছু ঘটে গেল, যেগুলোকে কুরআন পাকের স্বয়ং তাফসীর বলেই মনে হল। আর বাস্তবিকও তা-ই এবং এটা পরিস্কার বুঝা যেত যে, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী বিশ্বজনীন। সামষ্টিক ও জাতীয় ব্যাপারে উত্থান-পতনে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরাট দখল রয়েছে।

নিঃসন্দেহে তখন কুরআন পাক তেলাওয়াত করে খুব ভালভাবেই অনুভব করতাম যে, এটি সাধারণ কিছু নয়। এ এক জীবন্ত কিতাব। তাতে বর্ণিত হয়েছে জীবন্ত মানুষদেরকে নিয়ে বহু কিছু। যাদের কীর্তি-কাহিনী কুরআন জানিয়েছে, তারা সকলেই যেন জীবন্ত আত্মার ধারক। কুরআন এক দর্পণ, যেখানে মানুষ দেখতে পায় আপন সত্তার স্বরূপ, যেখানে সে খুঁজে পায় নিজেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

'আমি তোমাদের নিকট আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের আলোচনা সম্বলিত।'

তাফসীরকারক আলেমগণ এ আয়াতের বহু ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা হল, আমি তোমাদের উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস র. একবার এই আয়াত অন্যকে পড়তে শুনলেন। শুনেই বলে উঠলেন, বল দেখি কুরআন শরীফে কোন্ আয়াতে আমাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে? কিছু পাতা উল্টানোর পর একটি আয়াত পড়ে থেমে গেলেন তিনি। বলে উঠলেন, 'পেয়ে গেছি আমি আমার কথা। আমার নিজের সন্ধান পেয়েছি আমি এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মধ্যে।' সেই আয়াতটি ছিল-

'আর কোন কোন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি পাপকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদের ক্ষমা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।'

আমার কাছে খুব অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়েছিল যে, এই অনন্য অদ্বিতীয় পুণ্যগ্রন্থে একদিকে যেমন বর্ণিত হয়েছে জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের ইতিবৃত্ত, অপরদিকে আমার পরিচিতিও পরিষ্কার দৃশ্যমান হত নিজস্ব আঙ্গিকেই। এই আত্মিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমার একদিকে যেমন কুরআন শরীফের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, তেমনি তার মাঝেই পেয়ে যাই প্রকৃত সুখের সন্ধান। আমি তখন সূরা মায়েদা, আন'আম এক ভিন্ন আগ্রহ নিয়ে পড়তাম।

শিক্ষা জীবনের গতিধারা

আলী মিয়া বলেন, আমার শিক্ষাজীবনের গতিধারা ছিল অন্যদের তুলনায় একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমি একটি বিরাট সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলাম। যাকে শুধু সুবর্ণ সুযোগ বলব না, বরং তা ছিল এক খোদায়ী দান। আর তা হল, আমি আমার ছাত্রজীবনে এক একটি বিষয় আলাদাভাবে পড়েছি। একই সাথে বিভিন্ন ধরনের বিষয় পড়ার চাপ আমাকে সহ্য করতে হয়নি। সুচিন্তাশীল অভিভাবক আল্লামা আরাবী সাহেব র. সর্বপ্রথম আমার আরবী সাহিত্যের পাঠ সম্পন্ন করে দেন। সে বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করানোর পথে আল-মুতাআলাতুল আরাবিয়ার মত পুস্তিকা থেকে শুরু করে নাহজুল বালাগাহ, হামাসা ও দালাইলুল ইজাযের মত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী একাধারে তিন বছর তিনি আমাকে পড়ান এবং আমি আরবী সাহিত্য ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী আয়ত্ত করে নেই।

সুরুচিসম্পন্ন যোগ্য উস্তাদের সার্বিক ও সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের বরকতে এবং দিনরাত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কাটানোর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই আরবী ভাষার সাথে আমার গড়ে উঠে এক অবিচ্ছেদ্য সখ্যতা। ফলে এ ভাষার সূক্ষ্ম কথার সূক্ষ্মতা বুঝতে বেগ পেতে হত না। সকল সূক্ষ্মতা সহজেই বুঝে আসত। ফলে কুরআনের অলৌকিকতা আমার কাছে প্রকাশ পেল। আর সেই অলৌকিকতা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে লাগলাম। দ্বিতীয় কোন দলীলের প্রয়োজনও পড়ত না বরং কুরআনে কারীমের প্রতিটি শব্দই সাক্ষ্য দিত যে, এটি আল্লাহর কালাম ও বাণী। সমগ্র জগতের অনিশ্চয়তাও তার মধ্যে অণু পরিমাণ সন্দেহ সৃষ্টি করতে অক্ষম। আরবী সাহিত্য চর্চার এই দান অসাধারণ বৈকি? এর ফলে কুরআন মজীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে পড়তে শিখেছি। শাশ্বত বাণীর সাহিত্যভাণ্ডার আমার সামনে খুলে গিয়েছিল অতি

পরিষ্কারভাবে। এই অপূর্ব ও অলৌকিক দানের কৃতজ্ঞতা হযরতের নিকট কিভাবে প্রকাশ করব তা বুঝে আসে না। তার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার দৃষ্টিতে আমাদের মাদরাসাগুলোতে প্রচলিত আরবী সাহিত্য চর্চার বর্তমান পদ্ধতির মাধ্যমে এ ধরনের সুফল ও যোগ্যতা অর্জনের আশা করা যায় না। সাহিত্যের ধরন বুঝতে হলে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরুচি সৃষ্টি করতে হলে, আদি যুগের প্রাণহীন-চমকহীন অলঙ্কারশাস্ত্রের কিতাবাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। ভাষা সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের ধারণা সৃষ্টি করতে এ পুরোনো বই ব্যর্থ। এ সমস্ত মধ্যযুগীয় বইপত্রের রচনাকাল ছিল আরবী ভাষার অধঃপতনের সময়। এ জাতীয় বইপত্রের উপর ভিত্তি করে একে তো কুরআনের অলৌকিকতা অনুধাবন অসম্ভব, তার উপর কুরআনে কারীমে বর্ণিত আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতপূর্ণ বাণীর মর্ম উদ্ধার দুষ্করই বটে। তবে দু'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তো থাকবেই।

হযরত আরাবী র. -এর কাছে নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করার পর আল্লামা তাকীউদ্দীন হিলালী মারাকেশী র. -এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়। তিনি ছিলেন সে যুগের আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের মহাপণ্ডিতদের অন্যতম। আরবী সাহিত্যের পর আমি কিছু ফিকাহ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করে অবশেষে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেব র. এর তত্ত্বাবধানে দুই বছর হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করি। তখনই হযরতের কাছে তাফসীরে বায়যাবীর কিছু অংশ পড়ে নেই। হযরত ছিলেন দরসে নেযামীর অত্যন্ত দক্ষ ও বিজ্ঞ একজন শিক্ষক। কিছুদিনের জন্য লাহোরে গিয়ে আমি হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী র. -এর সুযোগ্য ছাত্র হযরত মাওলানা আহমাদ আলী র. -এর তাফসীরের ক্লাসেও শরীক থাকতাম। তিনি কুরআনের ভিত্তিতে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা বেশি করতেন, যা থেকে আমি খুব একটা উপকার লাভ করতে পারিনি। কিন্তু তার শিষ্টাচার ও দুনিয়াবিমুখ চরিত্র আমার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

তাফসীর অধ্যয়ন

হযরত আলী মিয়া র. বলেন, লাহোর থেকে ফিরে এসে এবং দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর সম্পূর্ণ সময় তাফসীর অধ্যয়নের মধ্যেই কাটাতে শুরু করি। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও হামীদুদ্দীন ফারাহী

র. -এর তাফসীর দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি। তখন থেকে সর্বক্ষণ পুরাতন তাফসীর গ্রন্থগুলো পড়তে শুরু করলাম। আর এক গ্রন্থ পড়ে মনে যে প্রশ্ন জাগত তার উত্তর খুঁজে পেতাম অন্য গ্রন্থে। তখন আমি 'তাফসীরে জালালাইন', আল্লামা বগভী র. -এর বিশদ তাফসীর গ্রন্থ 'মা'আলিমুত তানযীল' ও আল্লামা যমখশরী র. -এর 'তাফসীরে কাশশাফ' গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ পড়ি। যতদূর মনে পড়ে আল্লামা নাসাঈ র. 'মাদারেক' -এর প্রায় অর্ধেক শব্দে শব্দে পড়েছি আর অর্ধেক মোটামুটিভাবে দেখেছি। ধারাবাহিকতার সাথে তাফসীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে যে দারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে বলা যায়, যে কোন একটি গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে মন ভরে না। মানুষের বুদ্ধিতে আল্লাহ তা'আলা কত শত বৈচিত্র রেখেছেন এক নির্বোধের মাথায় যে প্রশ্ন জাগে, তা অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনদের মনেও উদয় হয়নি। আমার মনে অনেক সময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, সন্দেহ হয়েছিল, যার জবাব কোন বড় তাফসীর গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। কিন্তু কোন পুস্তিকা কিংবা কোন টীকায় তার জবাব পেয়ে গেছি।

তাফসীরের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক হয়, যখন আমি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে পড়ানোর সুযোগ লাভ করি। তখন গভীর মনোনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করতাম। আল্লামা আলূসী র. -এর 'রূহুল মাআনী' থেকে প্রচুর উপকার লাভ করি। 'তাফসীরে কাবীর' সম্পর্কে আজকাল যত কথা শোনা যায়, আসলে সেটা বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়। কেউ কেউ তো বলেই ফেলেন, তাফসীরে কাবীরে তাফসীর ছাড়া সবই আছে। আমি পড়ে দেখেছি, কিছু অতিরিক্ত কথা থাকলেও প্রচুর জ্ঞানের কথা রয়েছে তাতে। এমন কিছু বিরল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তাফসিরখানিতে, যা সচরাচর অন্য কিতাবে পাওয়া যায় না। আজকালকার তাফসীর দেখার সুযোগ আমার হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো মনে দাগ কাটতে পারেনি। আল্লামা আবু হাইয়ান র. -এর 'তাফসীরুল মানার'টি বেশ পড়ার মত। এতে আধুনিক বিষয়াদির সমাবেশ হয়েছে। 'জুম'আল' কিতাবটি মাদরাসার শিক্ষানীতি ও সিলেবাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছে বিধায় মাদরাসা ছাত্রদের জন্য বিশেষ উপযোগী। 'ইরাবুল কুরআন' থেকেও বেশ সহায়তা আমি লাভ করেছি।

তখন পর্যন্ত আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী র. -এর তাফসীর খুব একটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। পুরাতন ইতিহাস গ্রন্থ ইত্যাদি পড়ে

অনেক বিষয়ে প্রশ্ন জাগলে সেগুলো নিরসনের উদ্দেশ্যে দরিয়াবাদ যেতাম। সেখান থেকে বহু উপকারী বিষয় শিখতে পেরেছি। সে বিষয়গুলো তাফসীরে মাজেদীতে ছড়ানো-ছিটানো আছে। 'তাফসীরে মাজেদী' পাঠকের জন্য বড় উপকারী কিতাব।

শিক্ষকতার জীবন পেরিয়ে নিজ প্রয়োজনে বহু সময় অনেক তাফসীর অধ্যয়ন করেছি। 'তাফসীরে তাবারী' পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, এটি শুধু একটি তাফসীর গ্রন্থই নয় বরং ইতিহাস ও সাহিত্যের একটি পাঠাগারতুল্য। এটি কাছে পাওয়া বিরাট নেয়ামতই বটে। জাহেলী যুগের আরবী বর্বরতা, আকাইদ শাস্ত্র ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও কিতাব নেই।

আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এটি সবিস্তারে লেখা বিরাট কোনও তাফসীর গ্রন্থ নয়। কিন্তু কুরআন বুঝার জন্য একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। তাফসীর অধ্যয়নকারীর জন্য এটি একটি বিরাট উপহার। এটি হল শাহ আব্দুল কাদের র. -এর তরজমা। এই অমূল্য গ্রন্থটি তাদেরই উপকারে আসবে, যারা তাফসীর শাস্ত্রের বিস্তারিত ও উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছেন এবং উপলব্ধি করতে পেরেছেন, বড় তাফসীরবিদগণও কুরআন পাকের সঠিক মর্ম উপস্থাপন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এ সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন শেষে যদি কেউ শাহ সাহেব র. -এর তরজমা পড়ে, তবে সে বুঝতে পারবে তিনি কত সুন্দর ও সুচারুরূপে এসব বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে উর্দু ভাষায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় ইলহামের মাধ্যমেই তিনি এ ব্যাখ্যা উপহার দিয়েছেন।

এ কিতাবে বহু মূল্যবান তথ্য ছড়ানো ছিটানো আছে। আমাদের উস্তাদ মাওলানা হায়দার হাসান খান বলেন, 'মাযাহেরে উলূম সাহরানপুর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুহাম্মাদ মাযহার নানুতুবী র. সমস্ত তাফসীর গ্রন্থ পড়ানোর শেষে শাহ সাহেব র. -এর এই তরজমা ছাত্রদের পড়াতেন।'

আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাথে আরও একটি বিষয় যোগ হয়েছে, তা হল- কুরআন পাকের সঠিক মর্মের দ্বার যখন উন্মুক্ত হয়, তখন পাঠক এই কালামের পরশে কথোপকথন করতে পারবে এই কালামের কথকেরই সাথে। কিন্তু তার উপায় হল, বেশি করে কুরআন তেলাওয়াত করা আর

নফল ইবাদত করা। এ কুরআনের মাধ্যমেই সে আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করবে। সাথে সাথে সে গড়ে তুলবে কুরআনের সাথে এক হৃদ্যতাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক, যার ফলে সে অবশেষে অনুভব করবে– আমি এক মহান সত্তার সাথে আলাপরত।"

সীরাতুন্নবী সা. ও আলী মিয়া

আলী মিয়ার সর্বপ্রথম শিক্ষালয় ছিল সীরাতুন্নবীর পাঠশালা। তিনি এমন বয়সে সেখানে প্রবেশ করেন, যখন সাধারণতঃ শিশুদের পাঠশালায় ভর্তি করা হয় না। এটা ছিল তার পারিবারিক পরিবেশ ও সুব্যবস্থার ফসল, যা তখন সেখানে বিরাজমান ছিল। দীর্ঘকাল থেকেই সীরাতুন্নবী তার পারিবারিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। বাড়ির প্রতিটি শিশুর জীবন সীরাতের রঙে রঙিন করাকে জরুরী মনে করা হত। এ পরিবারের শিশুদের সভ্য করে গড়ে তোলার পিছনে সদা ভ্রাম্যমান ক্ষুদ্র পাঠাগারের অবদান ছিল অসামান্য। যেখানে গদ্য-পদ্য সব ধরনের বই-পুস্তক পাঠ্য থাকত। এরপর আলী মিয়ার জীবনে যে মহামনীষীর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন তার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হাকিম মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল আলী র. ও তার প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশিক্ষণ, পথ নির্দেশনা ও সস্নেহ তত্ত্বাবধানের ফলে তিনি খুব অল্প বয়সেই উর্দু ভাষায় রচিত অনবদ্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন। আরবী সাহিত্যের পর উর্দু ভাষাতেই সংরক্ষিত আছে সীরাতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। কারণ, নিকট অতীতে উর্দু ভাষায় সীরাতের উপর যত কাজ হয়েছে, অন্য কোন ভাষায় ততটা হয়নি।

আলী মিয়া তার 'মদীনার পথে' নামক গ্রন্থে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে বিশেষভাবে কাযী সুলায়মান মনসুরপুরী বিরচিত অনবদ্য গ্রন্থ 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

এরপর যখন তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদনের ক্ষমতার অধিকারী হলেন, তখন নিজের পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট করেন আরবী ভাষায় রচিত সীরাতের মৌলিক গ্রন্থগুলোর ওপর। এগুলোর মধ্যে দু'টি গ্রন্থ শীর্ষস্থানীয় ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি ইবনে হিশামের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সীরাতুন নাবাবিয়্যা' আর দ্বিতীয়টি ইবনুল কায়্যিম রচিত 'যাদুল মাআদ'। এ সব গ্রন্থ পাঠে তিনি গতানুগতিক ধারায় চলেননি বরং নিঃসন্দেহে এসব ছিল তার দিবানিশির সঙ্গী। তার যাবতীয় মনোযোগের

কেন্দ্রবিন্দু, যা দ্বারা তিনি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতেন এবং ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে তার পরিচয় ঘটত। এতে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা তার নবীপ্রেমের বাগান সিক্ত করত, নবীর প্রতি তার প্রেম ও আবেগ-উচ্ছাসকে করত আরো সমৃদ্ধশালী। এ কারণেই জীবন গড়ার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পথ নির্দেশনার ক্ষেত্রে সীরাতের মর্মস্পর্শী ঘটনাবলীর কোন বিকল্প নেই।

মানুষের মন-মানসিকতার উৎকর্ষতাই কুরআনে পাকের পর সীরাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। উল্লেখিত দু'টি গ্রন্থের পর আরবী ও ইংরেজী ভাষায় সীরাতের আধুনিক ও প্রাচীন যে কোন গ্রন্থই হস্তগত হত, তা পাঠ করতে কখনো অলসতা করেননি। সীরাতের দীর্ঘ মেয়াদী ও গভীর অধ্যয়নের কারণে আলী মিয়ার যে কোন গ্রন্থে ও লেখনীতে সীরাতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তার লেখায় হাসি-কান্না, শোভা-সৌন্দর্য ও রূপ-রস সমস্তই সীরাতেরই অবদান। সীরাতের অনুসরণের বরকতেই তার যাবতীয় লেখা থাকত সদা সজীব। তার যাবতীয় শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎসই হল সীরাত। নিজের মনোভাব ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সুস্পষ্ট-প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতে শক্তিশালী প্রমাণ ও উপযুক্ত উদাহরণ সীরাতের অনুপম ঘটনাবলীর মাঝেই অনুসন্ধান করতেন। সীরাতের দ্বারাই তার মন-মস্তিষ্কে সৃষ্টি হত শক্তি, প্রেরণা ও গতি, জাগ্রত হত ঘুমন্ত প্রতিভা। তাই আলী মিয়ার এমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও লেখা নেই, যাতে সীরাতে মুহাম্মাদীর গভীর প্রভাব নেই।

২

শৈশবকাল

শৈশবের দিনগুলো

মানুষের শৈশবের দিনগুলো কত না বৈচিত্র্যময়। নানা দিকে ছুটোছুটি, খেলাধুলা, কচিমুখের মিষ্টিকথা আরও কত চঞ্চলতা, প্রাণভরা উচ্ছলতা আর স্নেহমাখা শাসনের মধ্য দিয়ে কেটে যায় সকাল-সন্ধ্যা। পড়াশুনা যতটুকু হয়, তা-ও আগডুম-বাগডুম', 'ঐ দেখা যায় তালগাছ', ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বাবা-মায়ের অতি আদর, এখানে সেখানে ঘুরতে যাওয়া, অন্যায় আবদার, রসনাবিলাস আর বর্তমান শিশু-কিশোরদের বিনোদনের নামে টিভি-ভিসিডিতে অশালীন-অর্থহীন সিনেমা, নাটক, কার্টুন দেখা, সময়-অসময় ঠাকুরদের ঝোলাঝুলি আর গোপালের হাস্যকর গল্প-কৌতুক নিয়ে পড়ে থাকা– এসবই তো চোখে পড়ে সচরাচর। যেখানে দ্বীন-ধর্ম থাকে উপেক্ষিত। প্রকৃত জ্ঞান বিদ্যা থাকে আলো-আঁধারে। বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে বস্তুবাদী জ্ঞান ও পার্থিব মোহ।

পরকাল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তার রাসূল সা. কে ভুলে এক সময় সে জগৎ-সংসার আবার কেউ কেউ নাস্তিকতায় মেতে উঠে। এভাবেই তো দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে বারবার। চাহিদাও পরিবর্তিত হচ্ছে। একেক সময় একেক চাহিদা। আলী মিয়ারও একদিন শৈশবকাল ছিল। যখন তার খান্দানসহ চারদিকে চলছে ইংরেজী শিক্ষার তোড়জোড়। বড় বড় চাকুরী, দুনিয়ার চাকচিক্য। কেমন যেন ইংরেজী শিখলেই পাওয়া যাবে অনেক ইয্যত-সম্মান, এমনই ভাবা হচ্ছিল। আলী মিয়ার খান্দানের অনেকেই ইংরেজী শিক্ষিত। সে সুবাদে তাদের কেউ কেউ অবস্থান করছে বিলেত, কেউবা আমেরিকা চলে যাচ্ছে। চাকুরীর পাশাপাশি লেখাপড়া করে ব্যারিস্টার হচ্ছে, যশ-খ্যাতি তাদের হাতের মুঠোয়। কেউবা জার্মান, জাপান থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরছে। যুগ সময়ও ইংরেজী শিক্ষার দাওয়াত দিচ্ছিল।

কেবল আলী! এ আলী মিয়াই ব্যতিক্রম। কারণ! তিনি তো হবেন গোটা উম্মতের আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার সোঁপান। ঘুণে ধরা সমাজের মেরামত করবেন তিনি। হবেন যুগের সংস্কারক আরব-আজমের মুখপাত্র। তাঁকে দিতে হবে গোটা উম্মাহর সার্বিক দিক-নির্দেশনা। সচেতন করতে হবে তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে। এই তো ছিল কুদরতের ফায়সালা।

বড় ভাই সাইয়িদ আব্দুল আলীর চিন্তাধারাও ছিল সুমহান। যিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। সকল আবেগ-তিরস্কার উপেক্ষা করে ছোট ভাইকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন দ্বীনী শিক্ষায়। বেছে নিয়েছিলেন ভাইয়ের জন্য ইলমে ওহীর শাশ্বত পথ। অনেক নিকটাত্মীয়ও তাকে তিরস্কার করে বলেছে, 'এতিম ভাইটিকে আরবী পড়াচ্ছ! মোল্লা বানাচ্ছ!' তিনি সহজ ভাষায় শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিতেন, 'আব্বাজান বেঁচে থাকলে যা করতেন, আমিও তাই করছি।' মূলতঃ বড় ভাইয়ের এ সিদ্ধান্ত, প্রেরণা ও উৎসাহ আর মায়ের পার্থিব সম্মান ও পদমর্যাদার প্রতি অনীহা আলী মিয়ার পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে।

বড় ভাই হলে এমনই হয়ো

আলী মিয়ার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। এ বয়সেই তার পিতার ইন্তেকাল হয়ে যায়। এরপর বড় ভাই সাইয়িদ আব্দুল আলীর মনে ছোট ভাইয়ের জন্য স্নেহ-মমতার ঢেউ খেলে যায়। তার মধ্যে জেগে উঠে

পিতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব। আলীকে নিয়ে বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মনেপ্রাণে লেগে যান তিনি। তাকে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের স্বার্থক উত্তরসূরী করে গড়ে তোলার জন্য তার ব্যাকুলতা ছিল অতুলনীয়। এক চিঠিতে তিনি তার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী র. -এর কাছে লিখেন, 'আমার অন্তরের প্রার্থনা, যেভাবে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ র. হতে আল্লাহ তাআলা ইসলাহী ও জিহাদী খেদমত নিয়েছেন, আলী থেকে যেন তার চেয়েও বেশি খেদমত কবুল করেন।'

জবাবে হযরত মাদানী লিখেন, 'আল্লাহ তা'আলা আলীকে যেন কল্যাণের দাঈ এবং অকল্যাণের প্রতিরোধকারী বানান এবং হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ র. -এর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের ধারক-বাহক বানিয়ে ইলমে লাদুনী দান করেন।'

এ পত্র থেকেই বুঝা যায়, বড় ভাই আলী মিয়ার দ্বীনী উন্নতি ও ইসলাহী খেদমতের মাকবুলিয়্যাতের জন্য কেমন ব্যাকুল ছিলেন।

আলী মিয়ার শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি তার সকল অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শীতা সফলভাবে কাজে লাগিয়েছেন। স্বয়ং আলী মিয়া বলেন, 'আমার বড় ভাই দু'টি বিষয়ের প্রতি খুব যত্নবান থাকতেন। প্রথমতঃ নামায জামাতের সাথে আদায় করা। দ্বিতীয়তঃ যখন আমরা লাখনৌতে জনাব নূরুল হাসান খানের বাড়িতে থাকতাম, তখন বড় ভাইয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল আমি যেন নবাব বাড়ির কর্মচারীদের সাথে খোলামেলা সম্পর্ক তৈরী না করি। কোন নোবেল-উপন্যাস যেন না পড়ি।'

আলী মিয়াকে পড়ার জন্য বড় ভাই নিজেই বই নির্বাচন করে দিতেন। সর্বপ্রথম তাকে সীরাতে খায়রুল বাশার এবং রাহমাতুল লিল আলামীন পড়তে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা উপেক্ষা করে তিনি আলী মিয়ার জন্য আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে দ্বীনী শিক্ষার পথ বেছে নেন।

তিনি তাকে আরবী, উর্দু, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা করে দেন। বিশেষতঃ আরবী ভাষা সাহিত্যে আলী মিয়ার যে বিশাল দক্ষতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার মূলে ছিল ভাইয়েরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তিনিই সর্বপ্রথম আলী মিয়াকে দিয়ে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের উপর আরবীতে প্রবন্ধ রচনা করান। এর দ্বারা আলী মিয়াকে আরবী প্রবন্ধ রচনার অনুশীলন ও সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের সংস্কার আন্দোলনের উপর জ্ঞান লাভ ও প্রেরণা সৃষ্টিই ছিল উদ্দেশ্য।

তিনি আলী মিয়াকে পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীনের বিশেষতঃ মুজাদ্দিদে আলফেসানী র., হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র., ইবনে তাইমিয়া র., ইবনে কাইয়িম র. -এর লিখিত কিতাবাদি পড়তে তাগিদ করতেন। আলী মিয়ার ইসলাহ ও তারবিয়াত এবং সকল প্রকার দ্বীনী তরীকার প্রতি সর্বদা গুরুত্ব দিতেন। তিনিই তাকে প্রথমেই সীরাতের মাদরাসায় ভর্তি করান এবং সীরাতের কিতাবাদি পড়তে দেন।

মোটকথা, বড় ভাই আলী মিয়ার লেখাপড়া, আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য সার্বক্ষণিক ফিকির করতেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন। একবার ১৯২৯ ইং আলী মিয়া এক পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পেলে বড় ভাই সে সময়ের বিশ টাকা পুরস্কার দিয়ে বলেন, তোমার শিক্ষক মণ্ডলী ও সহপাঠীদের দাওয়াত কর। পরক্ষণেই আবার বলে ওঠেন- না, না, এতে তেমন ফায়দা হবে না বরং এ টাকাটা মদীনা শরীফের মাদরাসা উলূমে শারইয়্যায় পাঠিয়ে দাও। আলী মিয়া তাই করেছিলেন।

মূলতঃ আলী মিয়ার ঐতিহাসিক জীবন গঠনে বড় ভাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

এমন মা আর কোথায় ক'জন!

আলী মিয়ার বয়স তখন নয় বছর। পৃথিবীর সবচেয়ে হিতাকাঙ্খী দরদী পিতা চলে গেলেন ওপারে। তার তত্ত্বাবধান ও জীবন গঠনের সকল দায়-দায়িত্ব পড়ল মায়ের কাঁধে। কুরআনে কারীমের বড় বড় সূরা তার মমতাময়ী মা তাকে শৈশবেই হিফয করান। পিতার অবর্তমানে একই সাথে পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ দিয়ে আলীকে বড় করেন মহিয়সী মা খাইরুন নিসা। আলী ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। কিন্তু মায়ের দৃষ্টিতে আলীর মধ্যে সমবয়সী অন্যান্য বালকের মত মেধা ও প্রতিভা দেখা গেল না। তাই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভাবনায় পড়ে গেলেন সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে। তবু অব্যক্ত আশায় বুক বাঁধেন। ছেলের জন্য সর্বদাই দু'আ করতে থাকেন মহান আল্লাহর দরবারে। ছেলের মেধা বিকাশ, লালন-পালন, শিক্ষা ও ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য অনেক অনেক প্রার্থনা করেছেন। মূলতঃ আলীর ঈর্ষণীয় সাফল্যের তার মায়ের ব্যাকুল দু'আই ছিল পাথেয়। শৈশব থেকে যতদিন বেঁচে ছিলেন সর্বদাই আলীর প্রতি তার দৃষ্টি ছিল দরদমাখা। আলী মিয়া নিজেই লিখেছেন- 'প্রথমতঃ নামাযের ব্যাপারে

তিনি কিছুতেই শৈথিল্য করতে দিতেন না। আমি এশার নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে যতই গভীর ঘুমই হোক না কেন, তিনি আমাকে জাগিয়ে নামায পড়াতেন। কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হতে দিতেন না। তেমনি ফজরের সময়েও জাগিয়ে দিতেন। মসজিদে পাঠাতেন। নামাযান্তে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে বসাতেন।

দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়ে তিনি কোন শৈথিল্য করতেন না এবং আমার প্রতি চরম স্নেহ-মমতা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারত না তা হল, আমি যদি খাদেমের বাচ্চাদের কিংবা কাজকর্মে নিয়োজিত গরীব বালকদের সাথে রূঢ় বা অন্যায় আচরণ করতাম, তাহলে তিনি শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়েই ক্ষান্ত হতেন না বরং হাতজোর করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতেন।

আলীকে নিয়েই ছিল তার মায়ের স্বপ্নের পৃথিবী। আশা করতেন আলী মিয়া একদিন পূর্বপুরুষদের সত্যিকার উত্তরসূরী, পূর্বসূরীদের সার্থক স্থলাভিষিক্ত, খ্যাতনামা আল্লাহভীরু পিতার খাঁটি কর্ণধার, স্বীয় বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক, ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ আলোর ফোয়ারা, দ্বীনের সাধক পুরুষ, ইসলামের এই দুর্দিনে নিরলস মুবাল্লিগ ও দাঈ হবে। এই ছিল তার মায়ের জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। তাই সর্বদা পুত্রের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ আর আহাজারী করতেন। যখন লিখতে শুরু করেছেন, তখন মায়ের উপদেশ ছিল, লিখার শুরুতে অবশ্যই এ দু'আটি লিখবে-

اللهم افضل ما تؤتى عبادك الصالحين.

সে চিঠির দাম দিবে কিসে?

আলী মিয়ার সম্মানিত মাতা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি নিজেই আলী মিয়াকে তারবিয়াত শিক্ষা দিয়েছেন। আলী মিয়া লাখনৌতে থাকাবস্থায় তার মা তাকে চিঠির মাধ্যমে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, জীবন গঠনের জন্য প্রশিক্ষণমূলক পত্র দিয়েছেন। আলী মিয়া বলেন, একবার আমার মনে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। আগ্রহ জাগে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি। আম্মা বড় ভাইয়ের মাধ্যমে আমার মানসিকতা জানতে পারলেন। অনন্তর চিঠিতে তিনি লিখেন, 'আলী! দুনিয়ার অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। এই সময় যারা আরবী লেখাপড়া শিখছে তাদের ঈমান-আকীদাই যেখানে ঠিক থাকে না, সেখানে যারা ইংরেজী পড়ছে তাদের

কাছে আর কি-ইবা আশা করা যায়? আবদ ও তালহার মত কয়জনকে পাবে? আলী! মানুষ মনে করে, যারা ইংরেজী পড়ে তারা বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করে। কেউ ডেপুটি হয়, কেউ জজ, কমপক্ষে উকিল-ব্যারিস্টার তো হবেই। আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

আলী! তোমাকে আরও একটি উপদেশ দিচ্ছি এ আশায় যে, তুমি তা মেনে চলবে। তোমার পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া কিতাবগুলো কাজে লাগাও। এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন কর। কোন কিতাব যদি না থাকে তবে সেটি আবদুর মতামত সাপেক্ষে কিনে ফেল। অবশিষ্ট কিতাবাদি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এর মধ্য দিয়ে তোমার সৌভাগ্য প্রকাশিত হবে। কিতাবগুলোও নষ্ট হবে না আর বুযুর্গরাও খুশী হবেন। আমি চাই, তুমি এসব কিতাবের ঐকান্তিক খেদমত কর।

লেখাপড়ার মনোযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে লিখেন, আলী সবকিছুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা অর্থহীন। যাদের এ ধরনের মন-মেজায তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। একজন ছাত্রের কেবল পড়াশোনাই করা উচিত। পরিধেয় কাপড় ছেড়া কিংবা জুতা ফাটা হোক, এতে লজ্জার কিছু নেই বরং এর জন্য গর্ববোধ করা উচিৎ। এমন অবস্থাই কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ হয়। এসব কষ্টের মধ্যেই ইলমের কদর হয়। বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান সেই, যে দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য বস্তু লাভ করে, আর তা হল শরী'আতের পাবন্দীতা। বর্তমানে ইলম সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য হয়ে গেছে। যে কেউ তা সহজেই হাসিল করতে পারে। দু' চারটে বই-পুস্তক পড়ল। ব্যাস, মানুষ ভাবতে থাকে ছেলে আমার যোগ্য হয়ে গেছে। অথচ হাজারও বিপদ-আপদ চোখের সামনে। এই চিঠি গভীর মনোযোগের সাথে দেখবে এবং বারবার পড়বে।'

ইলমে দ্বীন ও আরবী শিক্ষায় মনোযোগিতার জন্য লিখেন, 'আলী! এখন আরবী শেখার জন্য পরিশ্রম কর। কিন্তু তা অনিয়মিত নয়। স্বাস্থ্যের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে। শরীর ভাল থাকলে সব ভাল থাকবে। যা চাও হাসিল করতে পারবে। তুমি যতটা পরিশ্রম ইংরেজীর বেলায় করেছ, আরবীর বেলায় তা করলে এতদিনে অনেক কিছুই হাসিল হয়ে যেত। মনোযোগ দিয়ে এখনো যেসব কিতাবাদি পড়নি, পড়তে পারনি, সেগুলো পড়ে ফেল। যতটা সম্ভব আগের যুগের উলামায়ে কিরামের মত যোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা কর। যেগুলো শরী'আত বিরুদ্ধ নয়, সেগুলোই শিখতে চেষ্টা কর। সমস্ত মাসআলা-মাসায়েল খুব ভালভাবে অবগত হও। এ মুহূর্তে এই ইলমেরই

প্রয়োজন। আমার আন্তরিক বাসনা হল, তুমি যেন ইলমের ময়দানে সেই মর্যাদা লাভ কর, যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন বড় বড় আলেমগণ। যাদের দেখার জন্য আমার চোখ উন্মুখ, যাদের কথা শোনার জন্য কান অধির আগ্রহী এবং অন্তর ব্যাকুল। আলী! এর চেয়ে আর বড় কোন আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন তোমাকে সে গুণাবলী দান করেন, যাতে সে যুগ আবার ফিরে আসে। আমীন!'

আলী মিয়ার মা স্বল্প শিক্ষিতা হলেও তার এ জাতীয় কিছু চিঠি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত।

অন্য একবার তিনি লিখেন, 'আফসোস! আমরা এমন এক সময় জন্মেছি! আলী তুমি কারো কথা শুনো না। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও এবং আমার হক আদায় করতে চাও, তাহলে সেসব সিংহ পুরুষদের দিকে তাকাও, যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন। তাদের সম্মান ও মর্যাদা কী ছিল? শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্, শাহ আব্দুল কাদের সাহেব, মৌলভী মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাহেব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের ভেতর খাজা আহমাদ ও মৌলভী মুহাম্মাদ আমীন সাহেব মরহুম যাদের জীবন-মরণ ছিল ঈর্ষণীয়। শান-শওকতের সাথে তারা দুনিয়াতে থেকেছেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সুন্দরভাবে। এই সম্মান ও মর্যাদা কিভাবে লাভ করা যায়?

তোমাদের পরিবারের সকলেই ইংরেজী মর্যাদাধারী এবং আরো হবে। কিন্তু অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী কেউ নেই। এ মুহূর্তে এর খুব প্রয়োজন। এদের ইংরেজীর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ কিংবা প্রীতি ছিল না। তারা ইংরেজীতে অজ্ঞ ছিলেন। তাহলে এই মর্যাদা তারা কিভাবে লাভ করলেন?

আলী! আমার একশ'টা সন্তান থাকলেও আমি তাদেরকে এ শিক্ষাই দিতাম। এখন কেবল তুমিই আছ। আল্লাহ্ আমার নেক নেয়ামতের পুরস্কার দিন, যেন একশত সন্তানের গুণাবলী আমি তোমার থেকে পেতে পারি। এই জগতে এবং পরজগতে সুনামের অধিকারী হই। সুযোগ্য সন্তানের মা হিসেবে কথিত হই। আমীন!

আমি আল্লাহর কাছে সব সময় দু'আ করি, যেন তিনি তোমাকে হিম্মত দান করেন এবং তোমার মধ্যে সেই আগ্রহ জাগিয়ে দেন, যাতে তুমি সেই মহৎ গুণাবলী অর্জন করতে পার। তিনি যেন তোমাকে যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে আদায় করার তাওফিক দেন। আমীন।

এর চেয়ে বেশি কিছু আমার চাওয়ার নেই। চাওয়ার ইচ্ছাও নেই। অবশ্য আল্লাহ যেন তোমাকে সেই মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তোমাকে দৃঢ়পদ রাখেন।

লেখালেখিতে হাতেখড়ি

ওরিয়েন্টাল কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল মৌলভী মোহাম্মাদ শফী র. আলী মিয়ার সে সময়ের আরবী যোগ্যতা ও কিছু লেখালেখি দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "এ ছেলে যেন আরবীকেই তার জীবনের লক্ষ্য বানায়। এ ভাষাতেই যেন সে পাণ্ডিত্য অর্জন করে।" আর বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। আলী মিয়া আরবীকেই আপন জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন।

এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পেছনে তার বড় ভাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। বড় ভাই তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি বলে দিতেন। মূলতঃ আলী মিয়াকে আরবী পণ্ডিত ও পারদর্শী বানানোর লক্ষ্যে এটা ছিল তার বিশেষ কৌশল।

একবার তিনি আলী মিয়াকে বললেন, আলী! তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ মুজাহিদে আযম সাইয়িদ আহমদ শহীদ র. এর উপর আরবী ভাষায় প্রবন্ধ লিখ। আলী মিয়া বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে লিখতে শুরু করেন। বড় ভাই তাকে এ ব্যাপারে নানা রকম দিকনির্দেশনা দেন। বলে দেন, সে যেন প্রবন্ধ লিখার পূর্বে ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক বড় বড় গ্রন্থাবলী পড়ে নেয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করে নেয়। সেই সঙ্গে পড়ার সময় যেন এ সব বইয়ের ভাষা সাহিত্য, উপমা, পরিভাষা ভাল করে বুঝে নেয়।' ফলে তিনি বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বিশেষ করে আল্লামা ইবনে আসিরের 'আল-কামেল'।

আলী মিয়া তখন বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে সাইয়িদ আহমদ শহীদের উপর আরবী ভাষায় তথ্যপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখেন, যা মিশরের বিখ্যাত পত্রিকা 'আল-মানার' -এ প্রকাশিত হয়। এর দ্বারা তিনি তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই প্রচুর সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে এ প্রবন্ধটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে 'উম্মুল কুরা' নামক আরব পত্রিকা থেকে উর্দুতে অনুবাদ করেন, যা 'যামিনদার' পত্রিকায় ছাপা হয়। এভাবে তিনি ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করেন। তিনি তাকে বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশনা দিতেন। নতুন নতুন বাচনভঙ্গি ও পরিভাষার ব্যাখ্যা দিতেন। আলী মিয়া এভাবে

ধীরে ধীরে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে থাকেন। পরবর্তীতে দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা আবরী ও উর্দু সাহিত্যে কী পরিমাণ খেদমত নিয়েছেন!

এই বর্ণাঢ্য জীবনের পেছনে...!

হযরত আলী মিয়ার বর্ণাঢ্য জীবন বিনির্মাণে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের অবদান ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এর মধ্যে চারজন ব্যক্তিত্বের মৌলিক অবদান ছিল। যার সারসংক্ষেপ বলা যায়,

১. হযরত আলী মিয়ার মধ্যে ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, দ্বীনী মূল্যবোধ, দাওয়াতী জযবা, ইসলাহ ও সংস্কারের খেদমতের বুনিয়াদ গড়ে ওঠেছিল হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ বেরলভীর সীরাত এবং জিহাদী কার্যক্রমের প্রভাবে।

২. ইতিহাস এবং আরবী সাহিত্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, হযরতের স্বনামধন্য পিতা নাযেমে নদওয়াতুল উলামা হযরত মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই র. -এর প্রভাবে, পৈত্রিক সূত্রে।

৩. কবুলিয়াত, গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মান লাভ করেছিলেন তিনি তার মহীয়সী মাতা খায়রুননিসার সার্বক্ষণিক প্রাণখোলা দু'আ এবং আহাজারির কারণে।

৪. আর আলী মিয়ার জীবন বিনির্মাণে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন তারই বড় ভাই ডাক্তার মাওলানা সাইয়িদ আবদুল আলী সাহেব। বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে তার মধ্যে চিন্তার সমন্বয় এবং মেজাযের মধ্যে ভারসাম্যতা এসেছিল।

এ প্রসঙ্গে হযরত আলী মিয়া তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু খেদমতের তাওফীক দিয়েছেন এবং আরবদের সামনে কথা বলার ও তাদের দায়-দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুযোগ দিয়েছেন– সবই আমার সম্মানিত পিতার ইখলাস, আম্মাজানের দু'আ, ভাই সাহেবের তারবিয়াত এবং শিক্ষক ও মাশাইখের দু'আ, মহব্বত ও শফকতেরই ফসল।

৩

কেমন ছিলেন আলী মিয়া

দৈহিক গঠন ও পোশাক

হযরত মাওলানার দৈহিক গড়ন ছিল মধ্যম ধরন। উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। গায়ের রং ছিল ফর্সা। হাতগুলো ছিল কোমল। অনুভূতি ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি সর্বদা সাদা কাপড় পরতেন। খুবই সাদামাটা জামা ও পাজামা পরতেন। কখনো লম্বা, কখনো শিরস্ত্রাণ জাতীয় টুপি পরতেন। অধিকাংশ ঈদের নামাযে ও সফরে শেরওয়ানী পরতেন। ঈদের সময় মাথায় রুমাল ব্যবহার করতেন। জুব্বা, লাঠি, তাসবীহ ও পকেট ঘড়ি সাথে রাখতেন।

তাঁর জীবন ছিল সহজ-সরল, সাদাসিধে-অনাড়ম্বর। লেবাস-পোশাকে তাঁর কোন জৌলুশ প্রকাশ পেত না। তিনি কোন সময় অহংকারীর মত চলতেন না। দেশে হোক, বিদেশে হোক একই ধরনের সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরতেন। শেরওয়ানীর বোতামগুলো লাগানো থাকত। ছোট-বড় সকল প্রোগ্রামে তিনি শেরওয়ানী পরতে ভুলতেন

না। তার মধ্যে কোন লৌকিকতা ছিল না। আলী মিয়ার সকল কাজ ছিল গোছানো, পরিপাটি, সুশৃংখল। তিনি জাঁকজমক ভালোবাসতেন না। পাগড়ী তিনি নিয়মিত পরতেন না, তবে টুপির উপর মাঝে মাঝে রুমাল ব্যবহার করতেন। পেশাব-পায়খানার সময় তিনি পৃথক কাপড় পরতেন এবং পরে ওযু করে নিতেন। হুযুরে পাক সা. -এর পাক-পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সুন্নতের দিকে হযরতের সজাগ দৃষ্টি ছিল।

দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দ

হযরত মাওলানার খাস খাদেম হাজী আব্দুর রায্যাক সাহেব বলেন, আমি ১৯৬০ সাল থেকে হযরতের সাথে বাড়িতে এবং সফরে থেকেছি। হযরতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিনয় ও নম্রতা। তার সাথে অতিবাহিত চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে কেবল একবার কোন একটা কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে শুধুমাত্র এতটুকু বলেছিলেন, 'তাকলীফ হুয়ি' অর্থাৎ কষ্ট লাগল। আর এই দীর্ঘ সময়ে সবচেয়ে বড় আনন্দের মুহূর্ত ছিল ১৯৯৮ সালে, যখন আলী মিয়া হেরেমে উপস্থিত হলে চাবি বহনকারী শায়বী সাহেব কাবা শরীফের চৌকাঠে চাবি রাখলেন এবং তাকে তালা খোলার ইশারা করলেন। এরপর তিনি তালা খুলে কাবা শরীফে প্রবেশের মর্যাদা লাভ করলেন।

দুশ্চিন্তার মুহূর্ত

আলী মিয়া সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন ১৯৬১ সালে তার বড় ভাই ডা. আব্দুল আলী সাহেবের ইন্তেকালে। কারণ তিনি তখন বার্মা সফরে থাকায় তার জানাযায় উপস্থিত হতে পারেননি।

পছন্দনীয় খাবার

বছরের ডিসেম্বর ও জানুয়ারী ছাড়া বাকী ১০ মাস বরফ গলানো ঠাণ্ডা পানি পান করতেন আলী মিয়া। সকালের নাস্তা ও আসরের পরে এক সাথে একাধিক কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল তার। চায়ে মিষ্টি বেশি নিতেন এবং খুব গরম চা পান করতেন।

হাস্য-কৌতুক

হযরত মাওলানার স্বভাব নিরস ছিল না বরং তার রসবোধ ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। একবার ইঞ্জিনিয়ার ইমতিয়ায (যিনি নদওয়া পরিবারের নির্মাণ কাজ দেখাশুনা করতেন) হযরতের পা দাবাচ্ছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার

সাহেবকে বললেন, আপনি ছেড়ে দিন। কারণ, যেখানেই আপনার হাত লাগবে সেখানেই বিল্ডিং হয়ে যাবে।

একবার নদওয়ার স্টাফ হাফেয আতিকুর রহমান সাহেবকে যখন ছাপাখানা থেকে বাবুর্চিখানার দায়িত্বে আনা হল, তখন তিনি হযরতের কাছে অনুযোগ করলেন আর তিনি হেসে বললেন, 'শুধু আইন আর খা' এর পার্থক্য অর্থাৎ মাতবা' থেকে মাতবাখ হয়েছে।

হযরতের খাস খাদেম হাজী আব্দুর রায্যাক সাহেবের ব্যাপারে এক চিঠিতে আলী মিয়া লিখেছিলেন, 'এই লোকটি আমার সারা জীবনের সাথী আর বৃদ্ধাবস্থার লাঠি।'

৪

কর্মজীবন

মানুষ গড়ার কারিগর

১৯৩৪ সাল। আলী মিয়া নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শেষ করেছেন। এখন তিনি বিশ বছরের যুবক। চোখে সুন্দর ভবিষ্যতের দ্বীপ্ত আশা। গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ, কঠোর অধ্যবসায়, আর উম্মতের ফিকিরে লেগে গেলেন তিনি। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র. -এর খেদমতে থেকে তিনি গবেষণায় নিমগ্ন হন। মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী র. -এর তত্ত্বাবধানে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকে "আয-যিয়া" নামক একটি আরবী পত্রিকা বের হত। তিনি তাতে নিয়মিত একজন লেখক ও সহযোগী হিসেবে বিনা বেতনে কাজ করেছেন। এভাবে নানা কার্যক্রমে সাহিত্য চর্চায় অল্পদিনেই তিনি সুনাম-খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন।

এদিকে শাইখ তাকীউদ্দীন হেলালী নদওয়া ছেড়ে ইরাক চলে গেলেন। তার প্রিয় শাগরিদ আয-যিয়ার সম্পাদক মাওলানা মাসউদ

আযম নদভী তার শাইখের সান্নিধ্যে চলে যেতে চাইলেন আর নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান আলী মিয়াকে। নদওয়া থেকে আলী মিয়ার কাছে চিঠি পাঠানো হল। আলী মিয়া চিঠি পেয়ে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর সাথে পরামর্শ করে নদওয়ায় চলে আসেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে তাকে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি কয়েকটি দরসী কিতাবও পাঠদানের কথা বলা হয়। মূলতঃ ১৯৩৫ সালের ১৫ জুলাই তাকে দারুল উলূমের নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি দারুল উলূমের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর-পশ্চিমাংশের অসম্পূর্ণ গম্বুজের পাশের কামরায় অবস্থান করতেন। যা ছিল আয যিয়া পত্রিকার দফতর।

প্রথম বছর আলী মিয়াকে কুরআন মজীদের প্রথম দশ পারা, তিরমিযী শরীফের ২য় খণ্ড, তারিখুল উমামিল ইসলামিয়ার ১ম অংশ, হামাসার কিছু অংশ, আল কেরাআতুর রাশেদার কিছু অংশ পড়ানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠদান করেন। ফলে ছাত্ররা তার ক্লাসের প্রতি দারুণ আসক্ত হয়ে পড়ে। তার পড়ানো এবং বুঝানোর সহজ ভঙ্গিমা, সাবলীল ভাষা যে কোন ছাত্রকেই আকৃষ্ট করত। অবশ্য এ জন্য তাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে। তরজমাতুল কুরআন পড়াতে গিয়ে তো তিনি তাফসীরের প্রাচীন বড় বড় কিতাব এবং অন্যান্য বুনিয়াদী কিতাব অধ্যয়ন করেছেন। বিশেষতঃ তাফসীরে কাশশাফ, মা'আলিমুত তানযীল, মাদারেক ও রুহুল মা'আনী শব্দে শব্দে অধ্যয়ন করেন। তখনই তিনি কুরআনের অলংকার ও ইজাজের উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এক সময় তিনি বুখারী শরীফ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদীরও দরস প্রদান করেন।

১৯৪৮ সালে তিনি সহকারী শিক্ষাসচিব এবং সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর ইন্তেকালের পর ১৯৫৪ সালে প্রধান শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পরিচালক হিসেবে দারুল উলূমের সকল বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দারুল উলূমে যে নূরানী পরিবেশ ও দ্বীনী আলোর ফোয়ারা গড়ে উঠেছিল, নদওয়ার প্রতিটি অঙ্গন উদ্ভাসিত হয়েছিল সে আলোয়। নদওয়ার সুনাম-সুখ্যাতি হিন্দুস্তান পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা পৃথিবীতে।

মূলতঃ ১৯৩৪ সালের ১ আগস্ট তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় একজন শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর নদওয়া ছেড়ে আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। পূর্ণ ৬৫ বছরের দীর্ঘ এক সময় তিনি একজন সফল শিক্ষক হিসেবে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তার লেখালেখিও যথানিয়মে চলতে থাকে।

আরবী শিক্ষার অভিনব কৌশল

আলী মিয়ার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ শাইখ তাকীউদ্দীন হেলালী এবং মুহাম্মাদ আল আরাবী ছিলেন আরবী সাহিত্যের বড় মাপের সাহিত্যিক। হেলালী সাহেবের দর্শন ছিল, কোন ভাষা শিখতে হলে সে ভাষাকেই মাধ্যম বানাতে হবে। এতে অন্য কোন ভাষার সাহায্য নেওয়া যাবে না। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আলী মিয়ার উপরও পড়েছিল। তিনি মনে করলেন পরীক্ষামূলকভাবে কৌশলটি অনুসরণ করা যেতে পারে। সুতরাং তিনি আপন বড় ভাইয়ের অনুমতি ও উৎসাহ এবং মুহতামিম সহেবের অনুমোদন নিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রাথমিক স্তরের একদল ছাত্রকে নিজের কাছে রাখলেন। অন্য আরেকদল ছাত্রকে দারুল উলূমের কিছু অভিজ্ঞ ও সম্মানিত উস্তাদের কাছে দেওয়া হল। তারা তাদেরকে প্রাচীন পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিক্ষা শেষে উভয় দলের মাঝে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। তার বড় ভাই সকলের উপস্থিতিতে উভয় দলের পরীক্ষা নিয়ে আলী মিয়ার দলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

এ পদ্ধতিতে ছাত্রদের উপকার হওয়ার পাশাপাশি আলী মিয়ার নিজের উপকার হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। এতে তার মধ্যে আরবী ভাষায় কথা বলার সাবলীলতা এবং আরবী ভাষায় বক্তৃতা করার অসাধারণ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। আর সে কারণে দাওয়াত ও লেখালেখির ক্ষেত্রে আরব বিশ্বে তার যে অবস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, তা এরই ফসল বললে ভুল হবে না। তিনি আরবী ভাষা শিখা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

আলী মিয়া বলেন, আমার শিক্ষক জীবনের শুরু হয়েছিল কুরআন শেখানোর মাধ্যমে। ১৯৩৪ সালের পরে দারুল উলূমের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো আমাকে দেওয়া হয়। এক সময় আমি অনুভব করলাম, ছাত্ররা

কুরআন অধ্যয়ন, তার থেকে যথার্থ উপকারিতা লাভ এবং বিভিন্ন জ্ঞান ও নীতিমালা থেকে বঞ্চিত। কয়েক বছর কুরআনের খেদমত ও নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম, যারা তাফসীর অধ্যয়ন করবে তাদের জন্য এমন কিছু প্রবন্ধ তৈরী করা দরকার, যা কুরআনিক গবেষণার জন্য সহযোগী এবং তা কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রমাণে সহায়ক হবে। তাই ১৯৩৯ সালে ধারাবাহিক কিছু লিখতে সচেষ্ট হই। ছাত্ররা এসব বিষয়ের আলোচনা ক্লাসে লিখে নিত। পরবর্তীতে সেগুলো মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। সমাদৃতও হয় বেশ। এরপর দীর্ঘ সময় তা বন্ধ থাকে। ধরে নেওয়া হয়েছিল এ পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। ১৯৮১ সালে হঠাৎ নদওয়াতুল উলামার সহকারী নাযিমের কামরায় নদওয়ার ছাত্ররা এসব পাণ্ডুলিপি খুঁজে পায়। আমি তাতে দ্বিতীয়বার নযর দিলাম। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, চিন্তা-গবেষণার কিছু নমুনা, কিছু অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ সংযোজন করলাম। তা 'কুরআনের নীতিমালা' নামে মাকতাবায়ে ইসলাম থেকে প্রকাশ করা হয়। এ কিতাব কুরআন অধ্যয়নরতদের জন্য ব্যুৎপত্তি অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক একটি গ্রন্থ। এটি আরবী মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যভুক্ত করারও উপযোগী।

১৯৫৫ সালে দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে শরী'আ বিভাগ খোলা হয়। সে বিভাগের প্রধান ছিলেন মুস্তফা সুবায়ী। তিনি বিশ্বের খ্যাতনামা উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম পণ্ডিতদের তার প্রতিষ্ঠানে একত্র করার গভীর ইচ্ছা পোষণ করেন। ভারত উপমহাদেশ থেকে এ জন্য আলী মিয়া র. কে দাওয়াত করা হয়। আলী মিয়া বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে স্থায়ীভাবে অধ্যাপনার পরিবর্তে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দাওয়াত গ্রহণ করেন। কোন ভারতীয় আলেমের জন্য আরব দেশের ভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেওয়াটা শুধু আলী মিয়ার জন্য নয় বরং গোটা উপমহাদেশের আলেম সমাজের জন্য এক বিরল সম্মান বয়ে এনেছিল।

১৯৫১ সালে আলী মিয়া দামেস্কে প্রথম সফর করেছিলেন। এটি ছিল তার দ্বিতীয় সফর। তিনি ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে দামেস্কে উপস্থিত হন এবং ভার্সিটির কেন্দ্রীয় হলে লেকচার শুরু করেন। তখন প্রায় ৩ মাস তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং মোট আটটি বিষয়ে লেকচার দেন। তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে তার এ সফর শেষ করেন।

১৯৬২ সালে মদীনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই এর কার্যক্রম, চিন্তাধারা, সিলেবাস ইত্যাদি বিষয়ে গোটা বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদগণের দিকনির্দেশনা নেওয়ার জন্য সৌদি পত্রিকাসমূহে বিভিন্ন আলোচনা চলছিল। এ ব্যাপারে ভারত থেকে আলী মিয়ার নাম পত্র-পত্রিকায় খুব দেখা যায়। সুতরাং মদীনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যদের সাথে এ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে মজলিসে শূরায় স্থান দেওয়া হয়। আলী মিয়া র. ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এর সদস্য ছিলেন।

ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সকল ব্যক্তিত্ব এ ভার্সিটিতে অধ্যাপনার জন্য আহুত হন, তাদের মধ্যে আলী মিয়া ছিলেন উল্লেখযোগ্য। গাড়ী, বাড়ী, ভাতা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ এখনকার প্রায় ৩০ হাজার রিয়ালের সম্মানজনক এ চাকুরী আলী মিয়া নানা ব্যস্ততার কারণে গ্রহণ করেননি। অবশ্য মদীনা ইউনিভার্সিটির প্রধান দু' শাইখের অনুরোধে দু' মাসের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

শুভ পরিণয়

বড় ভাই সাইয়িদ আবদুল আলী র. -এর তত্ত্বাবধানেই বেড়ে উঠেছেন আলী মিয়া। কোলে পিঠে করে আলীকে মানুষ করেছেন তিনি। কোনদিন বুঝতে দেননি পিতার অভাব।

যখন আলী মিয়া বিয়ের উপযুক্ত হয়েছেন, বিয়ে করাতে হবে, তখন তিনি তার বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করলেন তাদের আপন মামাতো বোন তৈয়্যবুন্নেসার সাথে। ১৯৩৪ সালে ২০ বছর বয়সে বিবাহ করেন। নদওয়ার শাইখুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খান বিয়ের খুৎবা পড়েন। আব্দুল আলী অত্যন্ত ধুমধামের সাথে ছোট ভাইয়ের বিয়ের ওলীমা করেন। অবশ্য আলী মিয়ার কোন সন্তান হয়নি।

৫

আধ্যাত্মিকতা

অনন্য এক জীবন

আলী মিয়া র. প্রথম জীবন থেকেই আল্লাহওয়ালাদের সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। বংশীয় বুযুর্গদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন প্রতিটি মুহূর্তে। কিন্তু তার জীবনে যে মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং যার সোহবত তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, তিনি হলেন শাইখুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র.। স্বয়ং আলী মিয়া তার আত্মজীবনীতে লিখেন, আমার জীবনের পরম সৌভাগ্যময় দিন ছিল সেদিন, যেদিন আমার পরমপ্রিয় মুর্শিদ হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর সন্ধান পেয়েছিলাম। হযরত লাহোরীর সন্ধান না পেলে হয়ত আমার জীবন বর্তমান অবস্থা থেকে ভিন্নতর হত। সে জীবনে হয়ত শুধু সাহিত্য ও লেখালেখি ব্যতীত অন্য কোন দিকের আকর্ষণ,

আগ্রহ-আসক্তি পাওয়া যেত না। খোদাপ্রাপ্তি ও আল্লাহ্ পাকের মা'রিফাত হাসিলের কোন প্রেরণাও পেতাম না সে জীবনে।

বুকের গভীরে আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে খোদাপ্রাপ্তির আবেগ-আগ্রহ, আল্লাহর নামের মাধুর্য উপলব্ধি, তার প্রিয় বান্দাদের মহব্বত এবং ইসলাহ্ ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল।

প্রথম সাক্ষাত

১৯২৯ সালের মে মাসের কথা। গরম ছিল খুব বেশি। আলী মিয়া নিয়মবাঁধা লেখাপড়া থেকে ফারেগ হয়েছেন মাত্র। আগে কখনো দূরের সফরে যাননি। ঠিক এ সময় তার ফুফুর চিঠি আসে তার মায়ের কাছে। চিঠিতে আলী মিয়াকে গরমের ছুটিতে লাহোরে তাদের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। এ সফরই ছিল আলী মিয়ার জীবনে সর্বপ্রথম ও ঐতিহাসিক সফর। এ সফরে তিনি আল্লামা ইকবালসহ খ্যাতনামা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং বড় বড় মনীষীদের মজলিসে গমন করেন। হযরত লাহোরীর কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। এ সফরে হযরতের সাথে দেখা করার মানসিক প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। একই সময়ে আলী মিয়ার বড় ভাইয়ের চিঠি আসে তার ফুফুর কাছে। চিঠিতে আলী মিয়াকে অবশ্যই হযরত লাহোরীর সাথে দেখা করার জন্য তাকিদ করা হয়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহ। বিজ্ঞ ফুফা সাইয়্যিদ তালহা সাহেব আলী মিয়াকে হযরত লাহোরীর খেদমতে নিয়ে গেলেন। সে সময় আলী মিয়ার বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর। হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী তখন এই তরুণ আলী মিয়াকে অত্যন্ত স্নেহ ও মুহাব্বাতের সাথে গ্রহণ করেন। আলী মিয়ার নির্মল অন্তরে তখন থেকেই হযরতের মহব্বত ও ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার গরমের ছুটিতে দরসে তাফসীরে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি লাহোরে চলে যান। অন্যান্যদের সাথে খুবই অল্প সময় তিনি দরস নেন। এরপর হযরত লাহোরী আলী মিয়াকে নির্দিষ্ট একটি সময় দেন। এ থেকে আলী মিয়ার মধ্যে ইলমে মা'রিফতের স্ফূরণ ঘটতে শুরু করে এবং দ্বীনী প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

১৯৩২ সালে আলী মিয়া হযরত লাহোরীর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার দরসে অংশগ্রহণ করেন। হযরত লাহোরীর দরসে কুরআন, জুমআর খুতবা ও সাধারণ সমাবেশে আহলুল্লাহগণের আলোচনা চালু থাকত। মনে হত এটাই আলী মিয়ার আসল আগ্রহ, আসল দাওয়াত। এর সাথে হযরত

লাহোরীর সোহবতে বারবার উপস্থিত হওয়ায় তার সরল, সহজ, অনাড়ম্বর জীবন যাপন খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আলী মিয়ার। এতদিন যা শুধু শুনেই এসেছিলেন, এবার তার বাস্তব চিত্র হযরত লাহোরীর মাঝে দেখে তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় সাক্ষাত ও প্রথম বাই'আত

১৯৩১ সাল। দরসে তাফসীরে অংশগ্রহণের পর থেকে আলী মিয়ার অন্তরে হযরত লাহোরীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত বেড়ে যায়। তখন তিনি হযরত লাহোরীর হাতে নিজের রূহানী এবং ইসলাহী লাগাম ন্যস্ত করার চূড়ান্ত মনস্থ করেন। অবশেষে একদিন তিনি হযরত লাহোরীর কাছে মনের কথা খুলে বলেন। ব্যক্ত করেন বাই'আত হওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু হযরত লাহোরী নিজের পরিবর্তে তার শাইখ হযরত খলীফা গোলাম মোহাম্মাদ ভাওয়ালপুরীর খেদমতে কানপুর জেলার দীনপুরে একটি পত্র দিয়ে আলী মিয়াকে পাঠিয়ে দেন।

দীনপুরের পরিবেশ ছিল খুবই সুন্দর। দীনপুর বাস্তবেই দ্বীনপুর ছিল। কাদেরিয়া তরীকায় দিন-রাত মসজিদ, খানকা ও মহল্লায় আল্লাহর যিকিরে মুখরিত থাকত। এটি ছিল একটি ছোট গ্রাম। সেখানে আলী মিয়া খলীফা সাহেবের হাতে বাই'আত হওয়ার পরও হযরত লাহোরীকে নিজের পীর ও মুর্শিদ মনে করতেন। আর হযরত লাহোরীও আলী মিয়াকে নিজের শাগরিদ মনে করতেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে হযরত লাহোরী আলী মিয়াকে নিজের কাছে কিছুদিন অবস্থানের ইঙ্গিত দিলেন। ফলে নিরিবিলি পরিবেশে শাইখের সোহবতে থেকে যিকির-আযকার ও আত্মশুদ্ধির উন্নতি লাভের আশায় তিনি হযরত লাহোরীর খেদমতে হাযির হন। ঐ সময় হযরত লাহোরী তাকে লাহোরের শাহী মসজিদের একটি নীরব কামরায় অবস্থান এবং ইলমী কাজ ও কিতাবপত্র অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। তখন তিনি প্রায় তিন মাস হযরতের খেদমতে অবস্থান করেছিলেন। যিকির ব্যস্ততা আর তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য কোন ব্যস্ততা ছিল না। অনুমতি ছিল না কারো সাথে কথা বলার। মাগরিবের পর থেকে ইশা পর্যন্ত তিনি মগ্ন থাকতেন যিকিরে।

ইজাযাত ও খেলাফত

লাহোর থেকে ফিরে আসার পর আলী মিয়া দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় অধ্যাপনা ও কিতাবপত্র রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এতদসত্ত্বেও

তিনি হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর সাথে তার রূহানী যোগাযোগ চালু রাখেন সবসময়। হযরত লাহোরীও তার এ যোগ্য শাগরেদকে সব সময় মহব্বতের নজরে দেখতেন। ১৯৪৬ সালে হজ্বের সফর থেকে ফিরে এসে এক চিঠিতে হযরত লাহোরী আলী মিয়াকে লাহোরে আসতে বলেন। আলী মিয়া চিঠি পাওয়া মাত্র লাহোরে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন। ঐ সময় একদিন নিরিবিলি আলী মিয়াকে ডেকে নিয়ে নিজের কাদেরিয়া সিলসিলায় ইজাযত দান করেন।

মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী র. -এর সন্ধান

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানে গিয়ে নিজের রূহানী কেন্দ্র থেকে উপকৃত হওয়া আলী মিয়ার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তিনি তার এই রূহানী সফর ও ইসলাহী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন কোন রূহানী ব্যক্তিত্বের খোঁজ করতে থাকেন। এ ব্যাপারে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. তাকে তৎকালীন বিখ্যাত বুযুর্গ ও আলেম হযরত রায়পুরীর খেদমতে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। সেমতে তিনি হযরত রায়পুরী র. -এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রথম সাক্ষাৎ

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস। আলী মিয়া তার বন্ধু মাওলানা মনযুর নু'মানী র. এবং হাজী আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবকে সাথে নিয়ে রায়পুরী র. -এর সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হলে তিনি আলী মিয়ার সাথে মোয়ানাকা করার সময় বলেন, আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। তখনই প্রথম রায়পুরী র. কে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আলী মিয়ার। রায়পুরের খানকা ও সেখানকার পরিবেশ তার কাছে খুবই ভাল লেগেছিল। আলী মিয়া রায়পুরী র. -এর মাঝে খুঁজে পান তার রূহানী তৃষ্ণা নিবারণের খোরাক। তখন তিনি রায়পুরে দু'এক দিন অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু রায়পুরী র. -এর মহব্বত তাকে তাড়া করে ফিরছিল।

মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সাথে পরিচিত হওয়ার পর মাওলানা যাকারিয়া র. -এর সাথে দেখা হয়। এক চিঠিতে তিনি আলী মিয়াকে লিখেছিলেন, 'আমার কাছে আপনার রায়পুর সফরের গুরুত্ব অনেক। আমি এ বিষয়ে আপনাকে বারবার অনুরোধ করছি, যখনই সুযোগ পাবেন, কয়েকদিনের জন্য রায়পুরীর খেদমতে যাবেন। অন্য চিঠিতে লিখেছিলেন,

ইঞ্জিনের যেমন জ্বালানী প্রয়োজন, তেমনি এখানেও প্রয়োজন জ্বালানীর। আর সেই লিল্লাহী জ্বালানী এসব দরবারেই পাওয়া যায়।

রায়পুরের খানকা

সাহারানপুর থেকে ২০/২১ মাইল দূরে শোয়ালাক পাহাড়ের পাশে রায়পুর নামে একটি জায়গা ছিল। সেখানে যাওয়ার জন্য কোন পাকা রাস্তা ছিল না। রেল স্টেশন থাকা তো দূরের কথা। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এমন এক পল্লীতে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তবৃন্দরা ছুটে আসতেন, যেখানে অবস্থান করতেন মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী র. -এর সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী র.।

মুর্শিদের অন্তরে আলী মিয়ার স্থান

ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর আলী মিয়ার রায়পুরে যাওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয়। মুর্শিদ ও শাগরিদের মধ্যে এমনই সম্পর্ক স্থাপন হয়, যা মানুষের চোখে হিংসার রূপ ধারণ করে।

রায়পুরী র. আলী মিয়াকে এতই ভালবাসতেন যে, চিঠিতে আলী মিয়াকে সাইয়িদী ও মাওলায়ী (আমার নেতা, আমার সর্দার) লিখতেন। আলী মিয়াও রায়পুরী র. কে সাইয়িদী ওয়া মুর্শিদী বলে পত্র লিখলে রায়পুরী র. তার জবাব দেন, আপনি আমাকে সাইয়িদী ও মাওলায়ী লিখেন! আমি তো আপনার খাদেম। অন্য চিঠিতে রায়পুরী র. নিজেকে মাওলানা রুমী ও আলী মিয়াকে শামছে তিবরীজ লিখেছেন। এভাবে সম্পর্ক ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

হযরত রায়পুরী র. যখন ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে রায়বেরেলী সফর করেন, তখন একদিন আলী মিয়ার বাড়ী তাকিয়া কেলায় যান। সে সময় তিনি হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ র. -এর মসজিদের সামনে আলী মিয়াকে বলেন, "আমি আপনাকে চার সিলসিলায় ইজাযত দিচ্ছি।"

১৯৫০ সাল। আলী মিয়া স্বীয় পীর মাওলানা রায়পুরীর সাথে হজ্বে গমন করেন। এ ছিল আলী মিয়ার দ্বিতীয় হজ্ব। এ সফর সম্পর্কে রায়পুরী বলেছিলেন, "এ সফর আমি তোমার জন্যই করছি।" এ হজ্বের সফরে আলী মিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যময় দিন ছিল সেদিন, যেদিন তিনি পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। আলী মিয়া তার আত্মজীবনীতে

লিখেছেন, এ সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন কেবলই তার মুর্শিদের দু'আর বরকতে ও আল্লাহর মেহেরবানীতে। পরে আরো গিয়েছেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য আর হয়নি।

আলী মিয়ার বিশেষ কোন কাজে দেরী হলে খানা খাওয়ার সময় এসে দেখতেন, তার পীর ও মুর্শিদ না খেয়ে বসে আছেন আর সামনে রুমালে রুটি পড়ে আছে। তিনি আলী মিয়াকে দেখেই বলে উঠতেন, আমি তোমার জন্য পাতলা রুটি নিয়ে বসে আছি। কেননা সাধারণ রুটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

মদীনাতে তিনি নিজ শাইখের সাথেই ছিলেন। কিন্তু আলী মিয়ার আরও কিছু প্রোগ্রাম থাকায় তাকে ছাড়াই রায়পুরী র. ফিরে আসেন। জাহাজ যত সময় দেখা গেছে, শাইখ ততক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন আলী মিয়ার দিকে। হযরত রায়পুরী র. তার এই মুরীদকে কেমন স্নেহ-মহব্বতের চোখে দেখতেন, তা এসব ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি।

হযরত থানভী র. -এর সংস্পর্শে

১৯৩৮ এর আগস্ট মাস। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. চিকিৎসার জন্য লাখনৌ এসেছেন। তখন আলী মিয়ার বড় ভাই সাইয়িদ আব্দুল আলী স্নেহের আলী মিয়াকে নিয়ে প্রতিদিন থানভী র.কে দেখতে যেতেন। ঠিক তখন থানভী র. -এর ভাগিনা একটি গ্রন্থ রচনা করছিলেন, যা থানভী র. -এর খুব প্রিয় ছিল। সে গ্রন্থের আরবী ইবারত ঠিক করার দায়িত্ব তিনি আলী মিয়াকে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি থানবী র. -এর নেক নজরে ধন্য হন। থানভী র. একদিন আলী মিয়ার ভাইয়ের বাসায় যান এবং সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন।

আল্লাহর যিকির ও মুজাহাদা

যখন আলী মিয়া সুলূক ও মা'রিফাতের পথে চলতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকে তিনি আল্লাহর যিকিরকে অন্তরের খোরাক বানিয়ে নিয়েছিলেন। ভোর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের পর নফী-ইসবাতের যিকির করতেন। যখন পড়ালেখা করতেন তখন মাগরিবের পর যিকিরের অভ্যাস ছিল। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি কুরআন হিফয করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হিফয করতেন। ইশরাকের শেষে হিফয কুরআন শোনাতেন।

তারপর পিতার লেখা তাহযীবুল আখলাক কিতাব মুতালা'আ করতেন। তখন আবার দু'ঘণ্টার মত বুখারী শরীফও শুনতেন।

নিজের ইচ্ছা আর ভাবনাকে মুরব্বীদের সিদ্ধান্তে সঁপে দেওয়াই ছিল আলী মিয়ার চিন্তা। নিজের ইলমী জ্ঞানগত ও চিন্তাগত অসাধারণত্বের পরেও সবসময় নিজের ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে মুরুব্বীদের পরামর্শে চলতেন। বড় ভাইয়ের নির্দেশনা তিনি যেভাবে মেনে চলতেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলী মিয়ার জীবন ছিল মুজাহাদার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নদওয়ার জীবনে প্রায়ই এমন হত যে, তার নাস্তারই সুযোগ হত না। নাস্তা না খেয়েই সবক শুরু করতেন। অন্যের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। একবার গুরুত্বপূর্ণ এক সফরের কথা ছিল। কিন্তু হযরত রায়পুরীর ইচ্ছা ছিল সফর না করার। তিনি আলী মিয়াকে একথা বলার সাথে সাথেই তা মেনে নিলেন। চেহারায় অসন্তোষের লেশমাত্রও ছিল না। রায়পুরী র. এ অবস্থা দেখে খুব খুশী হলেন। প্রকৃতপক্ষে মুরুব্বীদের পরামর্শে চলাই প্রতিটি মানুষের জীবনে উন্নতির সৌপান।

৬

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী

রাসূলের ভালবাসা

আলী মিয়ার মধ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. -এর মহব্বত তথা তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতি ইশকের যে অবস্থা ছিল, তা পৃথিবীতে বিরল। আলী মিয়ার সাথে যারা সফর করতেন, তারা বলেন, হযরত অধিকাংশ সময় مولاى إنى إلى فضلك لفقير উচ্চারণ করতেন। ওয়াযের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসের উপর খুবই জোর দিতেন। কোনও ব্যক্তিকে বাই'আত করানোর সময়ও আকীদায়ে তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দিতেন। সকল কাজে সুন্নতের কঠোর অনুসরণ ছিল আলী মিয়ার জীবনের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হত আলী মিয়ার মধ্যে। সেটি হল, উম্মতে মুসলিমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। মুসলিম বিশ্বকে নিয়ে তিনি এতই চিন্তিত থাকতেন যে,

দিনের পর দিন বিনিদ্র রজনী কাটাতে হত তাকে। এজন্যই হয়ত মুসলিম বিশ্ব তাকে 'মুফাক্কিরে ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

আত্মগৌরব

আলী মিয়া জীবনে অনেক কিছু করেছেন। তার সাথে পৃথিবীর বড় বড় সংস্থার সাথে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কখনো তিনি এগুলো কাউকে বলেননি। 'আমি' বা 'আমরা' বলে কোন কথা তার অভিধানে ছিল না। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও ভালবাসার মাঝে সব হারিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে গিয়ে বলতেন, আল্লাহ্‌র তাওফীকে হয়েছে। এসব আমার আব্বাজানের ইখলাস ও বড় ভাইয়ের তারবিয়াতের ফল। আম্মাজানের দু'আর ফসল। আমি তো সাধারণ একজন মানুষ। কথা বলতে বলতেই তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। বড় ভাই ডা. আব্দুল আলীর কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলতেন। অহংকার নিয়ে কোনদিন কোন কথা বলেননি। তিনি নিজেকে গোপন রাখতে বেশি ভালবাসতেন। একবার একটি ঘটনা ঘটল। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রায়পুরী র. -এর খেদমতে এসেছেন। রায়পুরী র. তেমন কিছু বলছিলেন না। মজলিস চলছিল। খাদেমরা ভাবছিল, হযরত যদি কিছু বলতেন, তবে নতুন মুরীদদের অনেক ফায়দা হত। একজন খাদেম জিজ্ঞেস করলেন, হযরত সবরের অর্থ কী? হযরত চুপ করে বসে থাকলেন। তারা ভাবল, হয়ত হযরত শুনতে পাননি। আবার একটু জোরে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত সবরের অর্থ কী? তখন রায়পুরী র. বললেন, 'আলী মিয়ার কাছে জিজ্ঞেস কর।' আলী মিয়া বললেন, আমি তো শুধু বাহ্যিক অর্থ বলতে পারি। হযরত রায়পুরী র. বললেন, আমি তো তাও পারি না। এভাবেই আলী মিয়া পুরো জীবন কাটিয়েছেন। কাউকে কখনো ইংগিতেও বলেননি, আমার কাছে মুরীদ হও। কেউ মুরীদ হতে চাইলে তিনি তাকে অন্য কোন শাইখের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কেউ জোর করলে তখন বাই'আত করে নিতেন। আলী মিয়া নিজের নগণ্যতা, অযোগ্যতার অনুভূতি ও নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করাকে সালেকের জন্য জরুরী মনে করতেন।

কখনো কোন বই সম্পর্কে প্রশংসাপত্র আসলে তা কোনদিন লেখা বা বক্তৃতায় আনতেন না। কাউকে বলতেন না। শুধু বলতেন, আমি তো এর যোগ্য নই। এ গুণটি আলী মিয়ার মাঝে জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল। একেই তিনি জীবনের মূল কথা এবং এরই মধ্যে সালেকের নিরাপত্তা, তারাক্কী ও উন্নতি বলে অভিহিত করেছেন।

বাই'আত

বাই'আত একটি প্রতিজ্ঞা, চুক্তি এবং নতুন দ্বীনী ও ঈমানী জীবন শুরু করার পদক্ষেপ মাত্র। যার ফলে জীবনে কিছু পরিবর্তন আসে। অনেক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া সহজ হয়। আলী মিয়া বলেন, বাই'আত করা কোন রীতি নয় যে, এর জন্য কোন মুজাহাদার প্রয়োজন নেই। শুধু বরকত লাভ ও বিখ্যাত হওয়ার জন্য বাই'আত হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না।

উম্মতের দরদে আলী মিয়া

উম্মতের জন্য পেরেশানী আর অস্থিরতা সব সময় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। বড় মর্মাহত হতেন কাউকে দ্বীন ও মিল্লাতের ক্ষতি করতে দেখলে। শুধু এখানেই ক্ষান্ত হতেন না, এর কঠোর বিরোধিতাও করতেন। আরবদের সাথে আলী মিয়ার ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেক। তারপরেও তিনি আরব জাতীয়তাবাদের অনেক সমালোচনা করেছেন। তুর্কীদের ব্যাপারেও ঠিক তাই ঘটেছিল। সেখানকার ইসলামবিরোধী সরকারের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কলমও ধরেছিলেন। ভারত সরকার ইসলামী শিক্ষাকে অনৈসলামী শিক্ষায় রূপান্তর করতে চাইলে তিনি সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করে ও প্রবন্ধ লিখে এর অকুণ্ঠ বিরোধিতা করেন।

আরব বাদশাহ ও সুলতানদের সাথেও আলী মিয়ার ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। তিনি তাদের সাথে দেখা করতেন, কথা বলতেন নসীহতমূলক। দেশের সমস্যাগুলো তুলে ধরতেন তাদের সামনে। দেশের খেদমত, আল্লাহর সত্য বাণীকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে কথা বলতে ভুলতেন না কখনও। বিপদে বিচলিত হতেন না বিন্দুমাত্র। মানুষের ভাবনাই ছিল আলী মিয়ার ভাবনা। উম্মতের দরদে কেঁদেছেন বেঁচে ছিলেন যতদিন, ততদিনই। ভাবনার সাথে কাজও করেছেন মানুষের জন্য। মানুষ আজো তাই ভুলতে পারে না তাকে। হয়ত পারবেও না কোনদিন। হোক তাই।

উদার মানসিকতা

উদারতায় আলী মিয়ার অন্তর ছিল আসমানতুল্য বিশাল। পৃথিবীর সব মানুষের জায়গা ছিল সে অন্তরে। যার মাঝেই ভাল গুণ দেখতেন, তাকেই কদর করতেন অকৃত্রিম। অন্যায় দেখলে শুধরে দিতেন। যাদের সঙ্গে মিশতেন আগেই তাদের পরীক্ষা করে নিতেন। ফলে পরে আর কোন

সমস্যা হত না। আলী মিয়ার যত সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিল, তার দায়িত্বশীলদের সাথে ভ্রাতসুলভ আচরণ বজায় রাখতেন। যেন তাঁরই এক ভাই। যথাসম্ভব সব ধরনের সহযোগিতা করতেন। মানুষের ভবিষ্যত উন্নতির দিকে চিন্তা করে নিজের স্বার্থ পেছনে ফেলে অন্যের দিকে মনোযোগী ছিলেন সবচেয়ে বেশি।

কারো মনে কষ্ট না দেওয়া

আলী মিয়া ছিলেন সহজ মনের মানুষ। কারো দোষ অন্বেষণ করা, কারো ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা থেকে তিনি সব সময় বিরত থাকতেন। কাউকে কষ্ট না দেওয়া ছিল আলী মিয়ার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। কেউ তাকে ছোট মনে করলেও তিনি কখনো এর জবাব দিতেন না। সাথীদেরকেও বলতেন তাদের কিছু না বলতে।

কখনোই তিনি মানুষের অমঙ্গল কামনা করতেন না। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা তো চিন্তাই করতেন না। অন্যের ভুল ধরা থেকে বিরত থাকতেন সব সময়। শত্রুকে তিনি শত্রুই মনে করলেও তার ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতেন না। এজন্য অনেক সময় তার কাছের লোকেরা মনে করত, তিনি হয়ত সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানেনই না। অথচ পরে বুঝতে পারত, তিনি সবই জানেন। কিন্তু কিছুই বলছেন না। এ উদার মানসিকতার কারণেই অনেকে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আলী মিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

নম্রতা

আলী মিয়ার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করা। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবার সাথেই অত্যন্ত শান্ত মেজাযে কথা বলতেন। অহংকার করতেন না কখনো। 'এ কাজ আমি করেছি; -এমন কথাও বলতেন না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে কবুল করেছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য। এজন্য বড় একজন ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তার আচরণ ছিল খুবই সাধারণ। আলী মিয়া যে দেশের অমূল্য রত্ন ছিলেন, তার আচরণে আদৌ তা প্রকাশ পেত না। তিনি মাঝে মাঝে ছোটদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, মনে হত তাদের থেকে কিছু শিখছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আলী মিয়া ছিলেন নবী করীম সা. -এর এ হাদীসের পূর্ণ অনুসারী– "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।"

মেহমানদারী

মেহমানদারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শত শত মেহমানের আগমন ঘটত তার ঘরে। তিনি আনন্দচিত্তে তাদের মেহমানদারী করতেন। খাওয়াতেন মন ভরে। রায়বেরেলী ও নদওয়ায় তিনি প্রায়ই মেহমানদের সাথে খানা খেতেন। কোন মেহমান এলেই আগে চা ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করতেন, অমুক মেহমানকে আপ্যায়ন করা হয়েছে কি না। অনেক সময় মেহমানদের পথ খরচ আছে কি না জিজ্ঞাসা করতেন। প্রয়োজন মনে হলে জোর করে দিয়ে দিতেন। তার দরজায় মেহমানের আগমন ছিল উন্মুক্ত। সে মেহমান হিন্দু, মুসলিম কিংবা যে ধর্মেরই হোক না কেন, সকলকেই তিনি মন খুলে আদর-আপ্যায়ন করতেন। খুব আনন্দও পেতেন এতে। আর যারা আসত তারাও খুশি হয়ে ফিরে যেত।

কুরআনের প্রতি ভালবাসা

আলী মিয়ার সব কাজের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খুব মনোযোগের সাথে প্রতিদিন সকালে কুরআন তিলাওয়াত করতেন কমপক্ষে এক পারা। ছোট বয়সে হিফয করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মনের একান্ত ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি হিফয করে ফেলেন। তিলাওয়াত করতে থাকেন নিয়মিত। নফল নামাযেও কুরআন পড়তেন। জীবন সায়াহ্নে যখন তার তেমন শক্তি ছিল না, তখন কয়েকজন হাফেয শাগরেদের কাছ থেকে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন।

নামায ও জামাআতের যত্ন

নামাযের আকর্ষণ ছিল তার অফুরন্ত। আযানের পূর্বেই নামাযের প্রস্তুতি সেরে নিতেন। আযান হলে মসজিদে চলে যেতেন। আযানের পর নিজের ঘরে থাকা পছন্দ করতেন না। অন্যের জন্যও ছিল তা অপছন্দ। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা আলী মিয়ার জীবনে ঈর্ষণীয়। তিনি পায়ে হেঁটে নদওয়া থেকে গোয়েন রোড যাচ্ছিলেন। এশার জামাত ধরার তাড়া ছিল মনে। কিন্তু পৌঁছে দেখেন জামাআত শেষ। জামাআতের আশায় আরেকটি মসজিদে গেলেন। সেখানে গিয়েও হতাশ হলেন। অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। আলী মিয়ার অস্থিরতা দেখে এক লোক বলল, অমুক মসজিদে জামাআত দেরীতে হয়। সেখানে গেলেন, জামাআত পেলেন। যারপরনাই খুশী হলেন।

তিনি যখন ভীষণ অসুস্থ ছিলেন, তখনও জামাআতের সাথে নামায পড়তেন। অসুস্থতার ওজরে জামাআতে নামায না পড়ার সুযোগ থাকলেও তিনি তা করতেন না। নদওয়ার শিক্ষাসচিব বলেন, একবার আমি নদওয়ার সাবেক নায়েবে নাযেম আলী মিয়ার সাথে সফরে যাচ্ছিলাম। তখন ছিল রমযান মাস। দিল্লী যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। আমরা এশার নামায পড়ে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছি। আলী মিয়া বললেন, আমরা এখনো মুসাফির হইনি, তারাবীহ পড়তে হবে। ট্রেনের মধ্যে বিশ রাকাত তারাবীহ সূরা বাকারা দিয়ে নিজেই পড়ালেন। জীবনের যৌবনকে তিনি মূল্যায়ন করেছিলেন এভাবেই। কখনো কোন নামায, কোন জামাআত, কোন আমল তিনি ছাড়েননি।

জীবন সায়াহ্নে যখন অসুস্থই থাকতেন সবসময়; ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা ছিল অনেক, তখনো তিনি খাদেমদের নিয়ে জামাআতে নামায পড়তেন। জীবনের একেবারে শেষবেলায় নামায নিজ ঘরে পড়তেন। তাও শুধু ফজর। বাকী চার ওয়াক্ত নামায মসজিদ গিয়েই পড়তেন। জুমআর নামাযের গুরুত্ব দিতেন খুব বেশি। আযানের সাথে সাথে মসজিদে চলে যেতেন। সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করতেন নিয়মিত। জীবনের শেষ দিকে যখন মসজিদে যাওয়ার শক্তি ছিল না, তখন নিজ কামরায় জামাআতের সাথে নামায পড়তেন। ফরজ ও বিতর দাঁড়িয়ে পড়তেন। বাকী নামায বসে পড়তেন।

গরীবের সেবায় আলী মিয়া

গরীব-দুঃখী-অসহায়কে সাহায্য করা আলী মিয়া নিজের দায়িত্ব মনে ভেবে করতেন। তাইতো অসহায় মানুষের ভীড় জমত তার দুয়ারে। নিয়মিত ভাতা দিতেন কাউকে কাউকে। মানি অর্ডারে টাকা পাঠাতেন গরীব তালেবে ইলমেদের কাছে। কাউকে খালি হাতে ফিরাতেন না। অসহায় মানুষগুলো পথ চেয়ে থাকত এই মানুষটির সাহায্যের আশায়। অসুস্থ রোগীদের সেবা করতেন মন থেকে। যে কোন পরিচিত বা দূরের আত্মীয়ই হোক না কেন, অসুস্থতার খবর পেলে ছুটে যেতেন। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালেও নিয়ে যেতেন। এভাবে সবসময়ই দুঃস্থ-অসহায়-রুগ্ন মানুষের সেবা করতেন, খোঁজ-খবর নিতেন নিয়মিত। কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন, ছুটে যেতেন, সান্ত্বনা দিতেন, কাফন-দাফনে অংশ নিতেন। অনেক অর্থই তিনি মানুষের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে।

পরিচ্ছন্নতা ও অনাড়ম্বরতা

সাদাসিধে জীবনযাপন খুব পছন্দ করতেন। দেশে-বিদেশে যেখানেই থাকতেন সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরতেন। অহংকার প্রকাশ হয় এমন পোশাক কখনো পরতেন না। যে কোন প্রোগ্রামেই শেরওয়ানী পরতেন। এতে ভুল হত না কখনো। আবার শেরওয়ানীর বুতামগুলোও লাগিয়ে রাখতেন। লোকে দেখে ভাল বলবে -এমন লোক দেখানো কাজ তিনি কখনো করতেন না। সব কাজ গুছিয়ে করতে ভালবাসতেন। পাগড়ী তেমন পরতেন না। তবে মাঝে মাঝে টুপির উপর রুমাল পরতেন। বাথরুমে যাওয়ার সময় অন্য কাপড় পরে নিতেন। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখতেন। চুল-দাড়ি সব সময় ঠিক রাখতেন। ঘরের সৌন্দর্যের দিকেও খুব গুরুত্ব দিতেন। সব ব্যাপারেই তিনি সুন্নতে রাসূল সা. -এর দিকে খুবই যত্নবান ছিলেন।

আত্মভোলা মহামানব

ভোগের জিন্দেগী থেকে আলী মিয়া ছিলেন বহু দূরে। এ নশ্বর পৃথিবীর মোহ তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তবুও হাজার টাকার চাকুরীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সানন্দে। দামেস্ক ইউনিভার্সিটি, মদীনা ইউনিভার্সিটির চাকুরীর লোভনীয় প্রস্তাব হাসিমুখে ফিরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে গিয়েছিলেন। আলী মিয়ার দুয়ারে বড় বড় পদমর্যাদা এসে করাঘাত করেছে, তিনি ফিরে দেখেননি। মুক্ত থেকেছেন এর মহব্বত থেকে।

একবারের ঘটনা। সৌদি আরবের শায়খ ওমর বিন হাসান আলী মিয়াকে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি ব্যাগ তাকে হাদিয়া পাঠালেন। তিনি মাত্র একটি রেখে সব পাঠিয়ে দিলেন। ১৯৮০ খৃস্টাব্দের আরেকটি ঘটনা। সৌদী আরবের শাহ ফয়সাল পুরস্কারের দুই লক্ষ রিয়াল পেয়েছিলেন। তিনি তা আফগান মুজাহিদদের জন্য এবং অন্যান্য খাতে সব দান করে দেন। ১৯৮৯ এর কথা। বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে দুবাই থেকে পেয়েছিলেন দশ লাখ দিরহাম। ভারতের বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে সেগুলোও দান করে দিয়েছিলেন। জীবনের সম্মাননা-পুরস্কারগুলো এভাবেই বিলিয়ে দিয়ে গেছেন মানবতার সেবায়।

পঞ্চান্ন টাকার সাধারণ বেতন আর পরবর্তীতে বিনা বেতনে জীবন কাটিয়েছেন। দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তির এই মহান চরিত্রকে তিনি সমুন্নতই রেখেছিলেন চিরদিন। মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়েছেন মুজাহাদার জীবন। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে কবুল করে নিয়েছিলেন তার প্রিয় বান্দা হিসেবে। নিয়েছিলেন একান্ত আপন করে। আর তিনিও আল্লাহর ভালবাসায় সব উৎসর্গ করেছিলেন একাগ্রভাবে।

৭

দাওয়াত ও তাবলীগ

তাবলীগী জামাআতের সাথে আলী মিয়ার সম্পর্ক

১৯৩৯ সালের কথা। আলী মিয়ার বন্ধু মাওলানা মনযুর নুমানী র. -এর কাছে তার রচিত গ্রন্থ 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' হাদিয়া পাঠালেন। মাওলানা নুমানী কিতাবটি পড়ে খুব খুশি হন। একটি পত্রও লিখে ফেললেন লেখকের নামে। ধন্যবাদের সাথে একটি প্রস্তাব পেশ করেন নতুন দ্বীনী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে। অবশেষে তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, আগে কতগুলো দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখবেন। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ভাল লাগলে তাদের সহযোগিতা করবেন, আরো অনুপ্রাণিত করবেন তাদের যুগোপযোগী কাজ চালানোর।

১৯৩৯ সালের শেষের দিকে তারা প্রথমে সাহারানপুর যান। তখন ঐ সময়ের বিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী র. -এর সাথে দেখা করে

তাদের সফরের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি খুশি হয়ে বলেন, আমার বয়স বেড়েছে। আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। তবে আপনাদের জন্য দু'আ ও সহযোগিতা থাকবে। তিনি তাদের সাথে একজন সহযোগী দিলেন। আর পরামর্শ দিলেন, আপনারা নিযামুদ্দীনে গিয়ে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সাথে দেখা করুন। তার তাবলীগ মেহনত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। ভাল লাগলে আপনারাও এ কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

আলী মিয়া তার পরামর্শ অনুযায়ী মেওয়াত সফর করেন। মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের তাবলীগী কাজের ব্যবস্থাপনা দেখে মুগ্ধ হন। আলী মিয়া বলেন, সেখানে গিয়ে মনে হচ্ছিল, এ বিংশ শতাব্দীর কোন দৃশ্য নয়, যেন হিজরী প্রথম শতাব্দী। বারবার স্মরণ হচ্ছিল সীরাত গ্রন্থসমূহে পড়া রাসূল সা. -এর যুগের মানুষের কথা।

১৯৪০ সাল। জানুয়ারী মাসের দিকে আলী মিয়া হাজির হন নিজামুদ্দীনে। তখন মাওলানা ইলিয়াস র. সাহারানপুরে ছিলেন। জানা গেল— দু'এক দিন পর তিনি নিজামুদ্দীনে ফিরবেন। আলী মিয়ার অন্তর ব্যাকুল হয়ে গেল হযরতজীর সাক্ষাৎ পিপাসায়। অনন্তর হযরতজী ফিরে এলে আলী মিয়া তাঁর সাথে এমনভাবে মিলিত হন, যেন বহু বছরের চেনা কোন আপনজন। হযরতজীর মহব্বত ও মেহমানদারীতে আলী মিয়া এতটাই খুশি হয়েছিলেন, যার ফলে দ্বিতীয়বার খুব তাড়াতাড়ি হযরতজীর খেদমতে হাজির হওয়া নিয়ত করে ফেলেন।

লাখনৌতে দাওয়াতী কাজের সূচনা

লাখনৌ ফিরে এসে আলী মিয়া কাজ শুরু করেন, যেমনটি দেখেছিলেন নিজামুদ্দীনে এবং হযরতজীর সোহবতে যা পেয়েছিলেন সে অনুযায়ী। শুধুমাত্র কয়েকজন পরিচিত ছাত্রকে নিয়ে লাখনৌর গরীব মহল্লায় হেঁটে হেঁটে দ্বীনের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ মানুষের মাঝে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। সাথে সাথে হযরতজীর কাছে চিঠির মাধ্যমে জানাতে থাকেন সব অবস্থা।

সর্বপ্রথম হযরতের চিঠি আসে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে। পরের মাসে আরেকটি পত্র আসে। শুরু হয় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ধারাবাহিকতা। সব চিঠিতে হযরতজী আলী মিয়ার কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। হযরতজী চিঠিতে আলী মিয়াকে এভাবে সম্বোধন করতেন, যা অন্যের ঈর্ষার কারণ হত। তিন-চার বছরের মধ্যেই আলী মিয়ার কাছে

হযরতজীর প্রায় ৩৫টি চিঠি আসে। পরবর্তীতে চিঠিগুলো মাকাতিবে ইলিয়াস নামে প্রকাশ করা হয়। সবগুলো চিঠিই ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। যার মাধ্যমে জানা যায় দুনিয়াতে আল্লাহকে পাওয়ার সহজ উপায়গুলো।

ছাত্রদের চরিত্র গঠনে তাবলীগী মেহনত

আলী মিয়া বৃহস্পতিবারে লাখনৌ থেকে ৮ মাইল দূরে মালাহর এলাকায় ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে চলে যেতেন। জুমআর দিন জামাআত তৈরী করতেন। তারা কাজ করতেন পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এ মেহনতের ফলে দ্বীনী ও ইসলাহী ফায়দা, নামাযের একাগ্রতা, যিকির ও রাত্রি জাগরণের উন্নতি ও ছাত্রদের কুরআন-হাদীস বুঝার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এর মধ্য দিয়ে হযরত মাওলানার সাথে কিছু ছাত্রের এমন গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যার কারণে তারা পরবর্তীতে দারুল উলূমের উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। হযরতজী ছাত্রদের এ মেহনতের কথা শুনে খুব খুশি হতেন, দু'আ দিতেন, চিঠিপত্রের মাধ্যমে আলী মিয়াকে মোবারকবাদ জানাতেন। কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাতেন।

সপ্তাহে, মাসে যখন ছাত্ররা জামাআতে বের হত, তারা খোশগল্পের একটা সুযোগ পেত। কিন্তু আলী মিয়া এই সময় অপচয়ের থেকে ছাত্রদের বাঁচানোর জন্য শুধু আরবীতে কথা বলার আদেশ দিতেন তাদের। এতে ছাত্রদের দ্বারা কম কথা বলা এবং কুরআন হাদীসের ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা সৃষ্টি হত।

হযরতজীকে চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হলে তিনি খুব খুশি হন। দু'আ করেন, আল্লাহ তাআলা যেন এই মেহনতের কাজে তাকে পরম আপন রূপে কবুল করে নেন। আলী মিয়া হযরতজীর খেদমতে হাজির হলে বা তার চিঠি গেলে তিনি খুব খুশি হতেন। আর আলী মিয়াও দু' এক মাস পরপর হযরতের সাক্ষাতে যেতেন। নতুবা তার মনেও অস্থিরতার অন্ত থাকত না।

লাখনৌতে হযরতজী

লাখনৌতে আগে থেকেই দাওয়াতের মেহনত চালু ছিল। কালক্রমে নদওয়ার উলামায়ে কিরাম, ছাত্র এবং আশেপাশের ধর্মপ্রাণ লোকদের মাঝেও এ কাজ শুরু হয়। দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে। লাখনৌ থেকে জামাত যাওয়া শুরু হয় নিজামুদ্দীনে ও মেওয়াতে। এ জামাতে

অংশগ্রহণকারীদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসতে থাকে। লাখনৌ শহর তখন মহামনীষীদের পদধুলিতে ধন্য হওয়ার যোগ্য।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাস। ইতোমধ্যে মাওলানা ইলিয়াস এসে ধন্য করে গেছেন লাখনৌর মাটি। একবার নদওয়া থেকে একটু দূরে মতিমহল পুলের কিছু আগে সবুজবাগ আঙ্গিনায় হযরত ও তার সঙ্গীরা নফল নামায পড়ে দু'আয় নিমগ্ন হলেন। দ্বিতীয় দিনে ঘুরে দেখলেন নদওয়ার সবকিছু। নদওয়ার যিম্মাদারগণের সাথে সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় হয় আলী মিয়ার বড় ভাই সাইয়িদ আব্দুল আলী সাহেবের সাথে। অল্প ক'দিনেই তাদের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। হযরত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরো নদওয়া দেখতে চাইলেন। আলী মিয়া হযরতকে মাদরাসার ছাদে নিয়ে গেলেন, যেখান থেকে দারুল উলূমের মসজিদসহ সব দৃশ্যই দেখা যায়। সহসা কথা প্রসঙ্গে হযরত আলী মিয়াকে বললেন, আমি দারুল উলূমের কী খেদমত করতে পারি বলুন? "আপনি মাদরাসা মাযাহিরে উলূম যে নজরে দেখেন, নদওয়াকে সেই একই নজরে দেখবেন, এ টুকুই চাই" বললেন আলী মিয়া। দু'হাত তুলে নদওয়ার জন্য দু'আ করলেন এ মহান ব্যক্তিত্ব।

ধন্য হল রায়বেরেলী

রায়বেরেলীর মাটিও গর্বিত হল তাঁর আগমনে। নিজেকে ধন্য মনে করল প্রতিটি অনুকণা। লাখনৌ ঘুরে রাতে তিনি কিছু সঙ্গী-সাথী নিয়ে রায়বেরেলীতে এলেন। তাশরীফ রাখলেন দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লায়। সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সাইয়িদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী র. -এর মসজিদে গিয়ে যারপরনাই খুশি হন। নির্ধারিত সময়ে কুরআন তিলাওয়াত করেন। এরপর আলামুল্লাহ সম্পর্কে সুউচ্চ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দুপুরের গাড়িতে ফিরে যান দিল্লী।

হযরতজীর কাছের মানুষ

আলী মিয়া বেশির ভাগ সময় হযরতজীর সান্নিধ্যে কাটাতেন। লাখনৌতে হযরতের ইসলাহী জলসা হত। সেখানে গণ্য-মান্য সব ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটত। হযরতজী স্বয়ং কথা বলতেন, শুনত সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে। কারও কোন কথা বুঝতে কষ্ট হলে আলী মিয়া বুঝিয়ে দিতেন। হযরতজীসহ সকলেই প্রীত হতেন এতে।

একবার হযরত আলী মিয়া ভোরে নিজামুদ্দীনে পৌঁছেন। হযরতজী তাকে ফজরের নামায পড়ানোর হুকুম দেন। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে

বয়ান করতেও বলেন। অনেক শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মহান ব্যক্তি ছিল মজলিসে। দ্বিধায় পড়ে গেলেন আলী মিয়া। হযরতজী সাহস দিয়ে বললেন, আগে শুরু তো করবেন। এরপর আলী মিয়া বয়ান শুরু করলেন। হযরতজীও আনন্দে অভিভূত হলেন তার বয়ান শুনে।

হযরতজী তার কাছে কাছে রাখতেন আলী মিয়াকে। একবার যিম্মাদাররা আলী মিয়াকে গাশতে পাঠিয়ে দিলেন। শুনে হযরতজী বললেন, এই একটিমাত্র মানুষ আমার কথা বোঝে আর তোমরা তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছ!

দারুল উলূম ছেড়ে তাবলীগে

মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতর কঠোর নিয়মের শিকলে নিজেকে আটকে রাখার মানসিকতা ছিল না আলী মিয়ার। সময় সময় বহুদূর চলে যেতেন দাওয়াতী প্রোগ্রামে। এভাবে বারবার নিজামুদ্দীন আসা-যাওয়ায় অধ্যাপনার কাজে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটত। তাই তিনি ১৯৪২ সালে মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার মনস্থ করেন। কাজেই তার রূহানী মুরুব্বী মাওলানা ইলিয়াস র. -এর কাছে। ছুটে গেলেন নিজামুদ্দীনে অনুমতির জন্য। মনের কথা খুলে বলেন হযরতজীকে। হযরতজী বললেন, আমাদের বুযুর্গরা বর্তমান চাকুরীর চেয়ে ভাল চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত চাকুরী ছাড়ার অনুমতি দেন না। দ্বিতীয়-তৃতীয়বারও একই কথা বললেন। সম্ভবতঃ তিনি আলী মিয়াকে পরীক্ষা করছিলেন। ফজরের নামাযের বয়ানের পর হযরতজী আলী মিয়ার কাছে জানতে চাইলেন, তাকে নদওয়া থেকে কত টাকা দেওয়া হয়? আলী মিয়া বললেন; পঞ্চাশ টাকা। হযরতজী বললেন, এমন হাজারো পঞ্চাশ টাকা আপনার খাদেমদের পদতলে কুরবানী হবে। অনন্তর তিনি চাকুরী ছাড়ারও অনুমতি দিয়ে দেন।

ব্যথাতুর আলী মিয়া

১৯৪৪ সালের কথা। হযরতজীর আদেশে আলী মিয়া করাচী ও হায়দারাবাদ সফরে গেলেন। সফর শেষে লাখনৌ ফিরেও আসেন। হযরতজী তখন খুব অসুস্থ। দিন দিন অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। এ সময় আলী মিয়া উপস্থিত হলেন হযরতজীর খেদমতে। আলী মিয়াকে ডেকে হযরতজী বলেন, "আমার জীবনের প্রদীপ নিভু নিভু প্রায়।" মাগরিবের পরে আলী মিয়াকে পুনরায় তার কাছে ডেকে নেন। মমতার হাতখানি

মাথায় বুলিয়ে দেন। শোয়া থেকে উঠে বসে চুমু এঁকে দেন আলী মিয়ার ললাটে। সান্ত্বনা দেন। ধৈর্য ধরতে বলেন।

১৯৪৪ সালের জুলাইয়ের ঘটনা। আলী মিয়াকে ডাকেন হযরতজী। কানে কানে বলেন, মানুষকে যিকিরের তাকিদ করুন, মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী র. -এর মজলিসে বসতে বলুন। ১২ তারিখের দিবাগত রাতে ডাক এসে পড়ে হযরতজীর পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার। চলে যান ওপারে। জীবনের ক্লান্ত মুজাহিদ ঘুমিয়ে পড়েন চিরদিনের জন্য। আলী মিয়া খুব কষ্ট পেলেন। নিজেকে বড় একা মনে হল হযরতজীকে হারিয়ে।

কিন্তু তিনি তাবলীগের কাজ ছেড়ে যাননি কখনো। দ্বিতীয় হযরতজীর পরামর্শমত আমরণ চালিয়ে যান দাওয়াতের কাজ।

লাখনৌর জমীনে তাবলীগের নূরানী আলোকচ্ছটা

তাবলীগের কাজের নূর খুব তাড়াতাড়ি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন আলী মিয়া লাখনৌ থেকে বিহারের পূর্ব সীমান্ত কটিহার ও পূর্নিয়া জেলা, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর দাওয়াতী কাজে সফর করেন মনযুর নুমানী র.কে সঙ্গে নিয়ে। সে সময়কার সফরের মধ্যে সীমান্ত প্রদেশ, মারি, পুনছ, কাশ্মীর এবং সুবাদাবাদের সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫১ সালের কথা। পূর্ণ এক বছর ভারতের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে দাওয়াতের কাজ করেন তিনি। লাখনৌ ফিরে এসে এখানকার জামাআতের অবস্থা দেখে খুব খুশি হলেন। শহরের সব ধরনের লোক এই মেহনতের মধ্যে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের অংশগ্রহণও ছিল প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক। প্রতিদিন ফজরের পর তারবিয়তী তাকরীর করতেন স্বয়ং আলী মিয়া। সেই নির্দেশনামত ছাত্ররা নিজ নিজ এলাকায় দ্বীনী মেহনত চালিয়ে যেত। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তারা এই মেহনতের প্রতিক্রিয়াও জানাত।

হিজাযের সফর

কালক্রমে আলী মিয়া চলে যান হিজায সফরে। সৌদী আরবের মাটিতে পা রেখেই তিনি বুঝতে পারেন, এখানকার অবস্থা তেমন ভাল নয়। এদেশের মানুষগুলোকে পাশ্চাত্যের নেশায় পেয়ে বসেছে। তিনি মনোকষ্ট নিয়ে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন সমাবেশ ও দাওয়াতী প্রোগ্রাম শুরু করেন। তার এই দরদমাখা আবেদন আরবের

শিক্ষিত সমাজের হৃদয়ে এক বৈপ্লবিক জোয়ার সৃষ্টি করে। এনে দেয় বিরাট পরিবর্তন। তারা বুঝতে পারে নিজেদের ভুলগুলো।

আলী মিয়া খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিভাবে পৌঁছাবেন সৌদীর আমীর-উমারাদের কাছে সত্যের এই দাওয়াত। অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে সৌদী বাদশাহর উদ্দেশ্যে ব্যথাভরা আবেগপূর্ণ একটি পত্র লিখেন। তারপর এ চিঠি তিনি লোক মারফত পৌঁছে দেন বাদশার কাছে।

ঘুরে এলেন আরব ভূমি

আরব বিশ্বের প্রাচীন কেন্দ্রীয় মারকায ছিল মিশরে। আলী মিয়া সেখানে সফরের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫১ সালের কথা। তিনি এক দাওয়াতী কাফেলা নিয়ে জেদ্দা থেকে ইতালীর ওনভা জাহাজে সফর শুরু করেন। মিশরে পৌঁছে ৬ মাস পর্যন্ত মানুষের মাঝে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। এতে সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে এক নব জীবনের সূচনা হয়। মিশর থেকে সুদান ও দামেস্কে সফর করেন। দামেস্ক থেকে মদীনা ও মক্কায় ফিরে আসেন। সেখানে পাঁচ মাস অবস্থানের পর ফিরে আসেন স্বদেশ ভারতে।

৮

পীর ও মুর্শিদ আলী মিয়া

মুরীদের প্রতি আলী মিয়া

হযরত আলী মিয়া বলতেন, বাই'আত করা বা সিলসিলায় সম্পৃক্ত হওয়া নিছক কোনও প্রথা নয় যে, এর জন্য কোন মামুলাত আদায় (নিয়মানুবর্তিতা পালন) করতে হবে না বা এর জন্য কোন মুজাহাদারও প্রয়োজন নেই। শুধু বরকত লাভ এবং বিখ্যাত হওয়ার উদ্দেশ্যে বাই'আত হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না বরং তিনি বলতেন, 'এটা একটা প্রতিজ্ঞা, চুক্তি এবং নতুন দ্বীনী ও ঈমানী জীবন শুরু করার পদক্ষেপ মাত্র। যার দ্বারা জীবনে কিছু পরিবর্তন, কিছু নিয়মনীতি ও দায়িত্ববোধ এসে যাওয়া সহজ হয়ে যায়।'

এ সম্পর্কে তিনি তার মুরীদীন এবং মুহিব্বীনদেরকে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত দান করতেন, তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে,

১. সর্বপ্রথম জরুরী কথা হল, বাই'আত হওয়া ও

সিলসিলায় দাখেল হওয়ার অর্থ হল, কালেমার উপর নতুন পাঠ। বাই'আতকে দ্বীনী ও ঈমানী জীবন শুরু করা এবং সে অনুযায়ী রাসূলের হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করার একটি চুক্তি মনে করতে হবে।

২. সবচেয়ে বড় কথা, আকীদা বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় করতে হবে। কালেমার উপর ঈমান রাখতে হবে এবং মুখেও স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ ব্যতীত জীবন-মরণ, শেফা-বিমারী, সন্তান দেওয়া, রিযিক দেওয়া, তাকদীরের ভালো-মন্দের শক্তি আর কারো নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাকে ব্যতীত কাউকে সেজদা করা যায় না। বন্দেগীর শুধু আকৃতি ধারণ করলে চলবে না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বালা-মুসিবত দূরকারী, হাজত পূরণকারী (ইত্যাদি) ভাবা যাবে না।

৩. সাইয়িদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যিনকে আল্লাহ তাআলার আখেরী নবী, হিদায়াতের মাধ্যম, শাফা'আতের ওসীলা, মহব্বত এবং অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হকদার মনে করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা পালন করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। মহানবী সা. -এর সীরাত অনুযায়ী জীবন গড়া এবং তার হাদীসসমূহ ও সীরাতের কিতাবসমূহ মুতালাআ করার আগ্রহ জন্মানোর চেষ্টা করা উচিত।

৪. জীবনকে ইসলামী কাঠামোতে ঢেলে সাজানো এবং জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য 'দস্তুরে হায়াত' গ্রন্থখানা মুতাআলায় রাখতে হবে। সাথে সাথে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. -এর মাওয়ায়েয ও মালফুযাত পাঠ করতে হবে।

৫. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, নামাযসমূহ নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সুন্নাতের পাবন্দী করা। নামাযের মধ্যে অলসতা ও গাফলতির ক্ষতিপূরণ কোন কিছুতেই হয় না। নামায জামাআতের সাথে মসজিদে আদায় করতে হবে। মহিলারা নামায সঠিক সময়ে পড়বে। মহিলাদের নামায সাধারণতঃ ব্যস্ততার কারণে এবং সাংসারিক ঝামেলার কারণে সঠিক সময়ে পড়া হয়ে ওঠে না। এটা কোনক্রমেই ঠিক নয়।

৬. দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় কাজে সওয়াব এবং রেযায়ে ইলাহীর নিয়তের অনুশীলন করা প্রয়োজন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আখলাকের অনুশীলন করা প্রয়োজন, যেন তাতে ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়। আর সকল কাজ যথাসম্ভব শরী'আত এবং সুন্নাত অনুযায়ী করা উচিত। চারিত্রিক

ও মেধাগত দুর্বলতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অতিরিক্ত ক্রোধ, বেশি কথা বলা, ধন-সম্পদ ও দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করা উচিত।

৭. যথাসম্ভব কুরআনে পাক তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৮. ফজরের নামাযের পূর্বে বা মাগরিবের নামাযের পর অথবা বাদ ইশা (যে সময় সহজ হয় এবং নিয়মিত করা যায়) এক তাসবীহ দরূদ শরীফ, এক তাসবীহ কালেমায়ে সুওম পড়বে। সেসাথে তাওফীক হলে শেষ রাতে কয়েক রাকআত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার চেষ্টা করবে এবং নিজের সিলসিলার মাশাইখ ও বুযুর্গদের জন্য দু'আ করবে।

সালেকীনদের তারবিয়ত ও মা'মুলাত

হযরত আলী মিয়া র. তালেবীন ও সালেকীনের তারবিয়তের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ, ব্যস্ততা, স্বাস্থ্য, ধারণ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও উন্নতির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি সকল অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যিকিরের তালকীন করতেন এবং সহজতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। প্রাথমিকভাবে শুধু তিন তাসবীহ আদায়ের মা'মুলাত দিতেন। কেউ বেশি চাইলেও তিনি তার অনুমতি দিতেন না। কাউকে সূরায়ে ইখলাসের দু'এক তাসবীহের অনুমতি দিতেন। কাউকে মুআমালা পরিশুদ্ধ করতে, ফারায়েযসমূহের পাবন্দ করতে এবং যে সকল দ্বীনী কাজে লিপ্ত আছে সেগুলিতে নিয়ত খালেস রাখতে পরামর্শ দিতেন। অধিকাংশ তালেবকে ৫০০ বার কলবী যিকির করার আমল দিতেন অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী বা যোগ্যতানুসারে যিকরে জেহরীর তালকীন করতেন। কেউ বাই'আত হলেই তাকে ২৪ ঘণ্টার মা'মুলাত বাতলে দিতেন।

হযরত মাওলানা আলী মিয়া র. মা'মুলাতের পাবন্দী করাকে খুবই জরুরী মনে করতেন। এক চিঠিতে তিনি তার একজন মুরীদকে লিখেছিলেন, 'মামুলাতের পাবন্দী করবে। কেননা এর দ্বারা কাজের মধ্যে বরকত ও নূরানিয়াত আসবে। অধিকাংশ সময় বায়আতের শব্দাবলী বলার পরপরই তালেবীনের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যেত। এরকম বহু ঘটনা রয়েছে যাতে, হযরতের হাতে বাই'আত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তির জীবনের আমূল পরিবর্তন এসেছে।

হযরত মাওলানা এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার হাতে এমন এমন আলেম ও সাধারণ লোকও বাই'আত হত যারা সুলূক এবং তাসাউফের

পথ পছন্দ করত না। কিন্তু তারা হযরতের চিন্তাধারার উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তার মহব্বতের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে হযরতের কাছে বাই'আত হয়ে নতুন জীবন লাভ করতেন। এদিকে লক্ষ্য করেই হযরত রসিকতার ছলে বলতেন, আমার খানকাহ 'আধুনিক খানকাহ'।

বাই'আতের পর সাধারণ মানুষদের বলতেন- ওলী, আবদাল, কুতুব কারো থেকে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ থেকে। তিনি বাই'আতের মধ্যে যে সকল কথার অঙ্গীকার নিতেন, যা নিম্নরূপ-

لا اله الا الله محمد رسول الله

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ পাকের সত্য রাসূল।

হে আল্লাহ! আমি তওবা করছি কুফর থেকে, শিরক থেকে, বিদআত থেকে, যেনা থেকে, চুরি থেকে, পরের মাল আত্মসাৎ করা থেকে, কারো উপর অপবাদ লাগানো থেকে, নামায ছেড়ে দেওয়া থেকে, মিথ্যা বলা থেকে এবং সকল গুনাহ থেকে, যে গুনাহ আমি সারা জীবন করেছি, ছোট হোক বা বড়। আরও অঙ্গীকার করছি, রাসূল পাক সা. -এর তাবেদারী করব এবং আপনার সকল হুকুম মানব। হে আল্লাহ! আমাদের তওবা কবুল করুন। আমাদের গুনাহ মার্জনা করুন। আমাদের নেক আমল করার এবং আপনার রাসূল সা. -এর অনুসরণ করার তাওফীক দিন।

এরপর হাত ছেড়ে দিতেন। বলতেন, এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ পাকই এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই শাসক, তিনিই বিধানদাতা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনিই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই চালান। তার হুকুম ব্যতীত বৃক্ষের পাতাও নড়তে পারে না এবং ক্ষুদ্র জিনিসও উড়তে পারে না। তিনিই রুজি দান করেন, তিনিই সুস্থতা দেন, তিনিই ইজ্জত দেন, তিনিই বেইজ্জত করেন।

বাই'আত হওয়ার পর সালেকরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের হালাত জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতেন। হযরত তাদের আত্মশুদ্ধির এই মোবারক রাস্তায় তাদের পথপ্রদর্শন করতেন। আলী মিয়া র. তার সাথে সম্পর্কিত সালেকীন ও তালেবীনদের মধ্যে যাদেরকে ভালো মনে করেছেন তাদেরকে ইযাযত ও খেলাফত দিয়ে দিয়েছেন।

দৈনন্দিন কর্মসূচী

আলী মিয়া প্রতিদিন রাতের শেষভাগে উঠে তাহারাত সেরে তাহাজ্জুদ আদায়ের পর ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ পাকের

যিকিরে মশগুল থাকতেন। ফজরের পর একটু হাঁটাহাঁটি করতেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে অসুস্থতা, দুর্বলতা ও অনিদ্রার কারণে এ সময়ে বিশ্রাম করতেন। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময় ছিল নাশতা ও লোকজনের সাথে সাক্ষাতের। তারপর চাশতের নামায, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে দুই-তিনজন সঙ্গী নিয়ে লেখাপড়ায় ব্যস্ত হয়ে যেতেন। সাড়ে বারটা পর্যন্ত বই-পত্র রচনা করতেন ও চিঠির জবাব দিতেন। যোহরের নামাযের পর খানা খেয়েই বিশ্রাম করতেন। আসরের নামাযের পূর্বে কখনো চিঠিপত্র লেখা, কখনো সাক্ষাৎ দান, কখনো কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের অভ্যাস ছিল।

আলী মিয়া আসরের পরে মেহমানদের সাক্ষাৎ দিতেন। মাগরিবের নামাযের বিশ মিনিট আগে নামাযের প্রস্তুতি নিতেন। মাগরিবের নামাযের পরে অন্দরমহলে প্রবেশ করতেন। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা পড়তেন। ইশার নামাযের পর খানা খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য লোকদের সাথে বসতেন। তারপর কিছু সময় নদওয়ার উস্তাদ ও ছাত্রদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। সাধারণতঃ রাত দশটায় তিনি ঘুমাতেন।

রমযান মাস ও আলী মিয়া

পবিত্র রমযান কুরআন পাক অবতরণের মাস, রহমত বরকত এবং ইবাদত বন্দেগীর বসন্তকাল। নবী করীম সা. রমযান মাসে খুবই গুরুত্বের সাথে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হতেন। আল্লাহপ্রেমিক ওলী-আল্লাহগণও এ মাসের যথাযোগ্য কদর করতে ভুলতেন না। কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী, শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন তাদের খানকাহে রমযান মাস অতিবাহিত করার জন্য যেসব কর্মসূচী প্রণয়ন করতেন তা সতিই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের উজ্জ্বল নমুনা ছিল। সেসব পরিবেশে মৃতপ্রাণে নব জীবনের সঞ্চার হত। আধ্যাত্মিকতার অনাবিল বারিধারায় সবাই অবগাহন করত এবং এক পাক-পবিত্র নতুন জীবন নিয়ে স্ব-স্ব এলাকায় ফিরে যেত।

হযরত আলী মিয়া র. তার কর্মজীবনের শুরুতে সফরের ব্যাপকতর কারণে বিভিন্ন রমযানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন। কোন সময় রায়পুরের খানকায়, কোন সময় সাহারানপুরে হযরত শাইখুল হাদীসের

খানকায়, কোন সময় অন্যান্য বুযুর্গদের সাহচর্যে রমযান মাস অতিবাহিত করতেন। অবশ্য একবার ১৯৪৬ সালে হযরত শায়খুল হাদীসের সাথে নিজামুদ্দীনে পুরো রমযান মাস অতিবাহিত করেন। সম্ভবত সত্তরের দশকের পর হতে তিনি তার নিজের জন্মস্থান রায়বেরেলীর তাকিয়া কেলায় রমযান মাসে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে থাকেন। সে সময় হযরতের ভক্ত, মুরীদ এবং মুহিব্বীনদের একটি ছোট জামাত হযরতের সাথে তাকিয়া কেলার মসজিদে রমযান অতিবাহিত করার জন্য জমা হতেন। এ দলটি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং নব্বইয়ের দশকের পর তা কয়েকশ'তে উন্নীত হয়েছিল। সে সময় পুরো রমযানে সালেকরা ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে হযরতের সোহবত হাসিল করার জন্য ছুটে আসতেন। তাকিয়া কেলায় রমযান অতিবাহিত করার সময় শেষ দশ দিন তিনি অবশ্যই ইতিকাফ করতেন। ঐ সময় তার ভক্ত মুরিদীন ও তালেবীন হযরতের কাছ থেকে ফয়েয হাসিল করার বেশ সুযোগ পেত। অবশ্য জীবনের শেষ রমযানে অসুস্থতার কারণে তিনি প্রায় ২০দিন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় কাটিয়ে ছিলেন। নিম্নে রমযান মাসে হযরতের একটি দৈনিক রুটিন পেশ করা হচ্ছে। অবশ্য হযরতের জীবনের শেষের দিকে অসুস্থতার কারণে সময়সূচীর সামান্য পরিবর্তনও হয়েছে।

রমযানের কর্মসূচী

আযানের পরপর ফজরের নামায আদায় করতেন। ইশরাক আদায়ের পর হযরত যেহেতু হাফেয ছিলেন, তাই অন্য কাউকে কুরআন শরীফ শোনাতেন। তারপর লিখতে বসতেন। বেলা এগারটার দিকে সাধারণ বৈঠকের মাধ্যমে তার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হত। এ বৈঠক হত কয়েকটি বিষয়ের ওপর। তন্মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এছাড়া 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' আরবী কিতাবের দরস হত। যোহরের নামাযের পর শুরু হত হযরতের বিখ্যাত সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ 'আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ' গ্রন্থের আরবী দরস ও ব্যাখ্যা। এ দরস প্রায় ৪৫ মিনিট স্থায়ী হত।

এরপর তিনি নিজ কামরায় গিয়ে অন্যের তিলাওয়াত শুনতেন। তারপর চিঠিপত্রের জবাব দিতেন। দেশ-বিদেশ থেকে আসা বিভিন্ন নতুন কিতাবের পাতা উল্টে দেখতেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়তেন। আসরের

নামাযের পর ফাযায়েলের কিতাব থেকে তালিম হত এবং শেষ দিকে তার নিজের লিখিত কিতাব 'আরকানে আরবাআ' থেকে রোযা অধ্যায় পড়ে শোনানো হত। এরপর দু'আ হত।

দু'আর পর মসজিদ সংলগ্ন সাই নদীর কূলে বকুল গাছের ছায়ায় বসে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন। মাগরিবের আযান হলে সবাইকে নিয়ে মদীনা শরীফের খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। মাগরিবের নামায শেষে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসে খানা খেতেন। খানার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। ইশার আযান হলে ইশা ও তারবীহর নামায পড়তেন। নামায শেষে বৈঠকখানায় পনের বিশ মিনিট বসে লোকজনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন। এরপর বাসায় যেতেন। বাসাতেই সেহরী খেতেন। রমযানের শেষ দশদিন তিনি ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফের জন্য সময়সূচীর সামান্য পরিবর্তন হত।

৯

সংগঠক আলী মিয়া র.

দ্বীনী মাদরাসা

দ্বীনী মাদরাসাগুলোর সাথে হযরত আলী মিয়ার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মুসলমানদের টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন। সকলের সামনে মাদরাসার বড়ত্ব তিনি যেভাবে প্রকাশ করতেন, তা ছিল শুধুই তার অন্তরের বাসনা। ছাত্রদের যেভাবে উৎসাহিত করতেন, তাতে বুঝা যায়, তার কাছে মাদরাসার গুরুত্ব ছিল কত! মাদরাসা বলতে তিনি শুধু নদওয়াই নয়; সব মাদরাসাকেই এক সুতায় গাঁথা মনে করতেন।

দূর-দূরান্তে সফর করতেন মাদরাসা দেখার জন্য, সেগুলোর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করতেন। প্রতিটি মাদরাসাকেই তিনি এক একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামের পাওয়ার হাউজ হিসেবে দেখতে চাইতেন।

রাবেতায়ে আদবে ইসলামী

আলী মিয়া র. ভাষা ও সাহিত্যকে দাওয়াতের অন্যতম বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর উন্নতি ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে রাবেতায়ে আদবে ইসলামী নামে একটি আন্দোলনের শুভ সূচনা করেন। এ আন্দোলনের প্রধান ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইউনির্ভাসিটির আরবী সাহিত্য বিভাগের প্রধান ডা. আব্দুর রহমান রাফাত পাশাসহ সেখানকার আরো ক'জন অধ্যাপক। আলী মিয়ার আরবী সাহিত্যের পাঠ্য কিতাব মুখতারাত গ্রন্থের ভূমিকা পড়ে আব্দুর রহমান রাফাত পাশা এ ব্যাপারে আরো অনুপ্রাণিত হন। সেই আকর্ষণে তিনি তার বেশ ক'জন সাহিত্যপ্রেমিক বন্ধুসহ মক্কা মুকাররমায় হযরতের খেদমতে এসে উপস্থিত হন এবং এ আন্দোলনের উপর ব্যাপক আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় আলী মিয়াকে এ আন্দোলনের সভাপতি এবং নদওয়ার বর্তমান নাযেম হযরত মাওলানা রাবে হাসানীকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয় এবং রাবেতার হেড অফিস লাখনৌ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শিবলী একাডেমী

দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলী একাডেমীর সাথে মাওলানা আলী মিয়ার ছিল গভীর সম্পর্ক। মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী ও মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কারণে দারুল মুসান্নিফীনের কাজে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে তিনি খুব খুশি হতেন। তিনি এবং তার বড় ভাই এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর পর আলী মিয়া র. কে মজলিসে আমেলার সভাপতি করা হয়।

তিনি নিয়মিত দারুল মুসান্নিফীনের সভায় হাজির হতেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি তার মুহতারাম পিতার রচিত গ্রন্থ 'গুলে রাআনা' এবং 'আসসিফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ' -এর উর্দু তরজমা প্রকাশ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এ প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত হয়। আলী মিয়া এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "মা'আরিফ" নিয়মিত পড়তেন। পত্রিকা বের হতে দেরী হলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে তার সবচেয়ে প্রিয় মাসিক পত্রিকার নাম জানতে চাইলে তিনি বলেন, মা'আরিফ।

এ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন তিনি। ইউপির সাবেক মূখ্যমন্ত্রী বহগুনার পক্ষ থেকে নদওয়াকে দেওয়া এক লাখ রূপীর বাজেটটি তিনি দারুল মুসান্নিফীনকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হযরত সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর সীরাত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন তিনি। এ ভূমিকা পড়ে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া খুব খুশি হন। হযরতকে ১ লাখ রূপী হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, এ হাদিয়ার প্রকৃত হকদার হচ্ছে দারুল মুসান্নিফীন ও সাইয়িদ সাহেবের বেগম সাহেবা। সেই মতে হাদিয়া দু'ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। দুবাই এবং ব্রুনাই পুরস্কারের কিছু হাদিয়া তিনি দারুল মুসান্নিফীনকে দিয়েছিলেন। জীবনের এমন আরো অনেক পুরস্কার তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন মুক্ত হস্তে। এ প্রতিষ্ঠানকে তিনি ভালবেসেছিলেন যথার্থভাবেই। মৃত্যু পর্যন্ত এর খেদমত করে গেছেন। ভুলে যাননি কখনোই।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী

১৯৬০ সালে যখন আরব বিশ্বে কম্বিং বিমান হামলা শুরু হয় তখন সৌদী আরব এর জন্য সময়োপযোগী ও যথার্থ এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা গঠন করা হয়। যার নামকরণ করা হয় 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'। এ সংস্থার কার্যক্রম ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের দ্বীনী এবং আর্থ-সামাজিক কাজে সহযোগিতা করা। খৃস্টান এনজিওরা সাহায্য-সহযোগিতার নামে মুসলমানদের যেভাবে মুরতাদ করছে, সেবা ও সহযোগিতার নামে যুবক-যুবতীদের ঈমান হরণ করে চলেছে, তার মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৩৮১ হিজরীতে মরহুম শাহ সৌদ বিন আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে এর প্রথম অধিবেশন মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। আলী মিয়া র. তখন মক্কাতে ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে হযরতকে দাওয়াত করা হয় এবং রাবেতার সদস্য মনোনীত করা হয়। রাবেতার সকল সদস্যদের উপর হযরতের বিশেষ প্রভাব ছিল। রাবেতার সভাপতি না থাকলে আলী মিয়াকেই সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হত। এক বছর তিনি রাবেতার মিটিংয়ে আসতে পারেননি। ঐ সময় রাবেতার প্রধান শেখ ছালেহ বলেছিলেন, খোদার কসম! শাইখ আলী না থাকায় রাবেতার মিটিং ফিকে হয়ে গেছে। তিনি থাকলে সভায় আযমত এবং নূরানিয়াত উপলব্ধি হয়।

মোটকথা, রাবেতার কোন সদস্যই হযরতকে ছাড়া কোন কাজ পূর্ণ হয় বলে মনে করতেন না।

মানবতার পয়গাম

তখন ১৯৫১ সাল। আলী মিয়া র. তার মানবতাবাদী দাওয়াতী কাজ শুরু করেন মুসলিম-অমুসলিমের এক জনসভার মাধ্যমে। এ জনসভায় তিনি আবেগময়ী এক বক্তৃতা করেন। সভায় নেমে আসে গভীর নীরবতা। সবাই অধীর হয়ে শুনতে থাকে তার কথা। এরপর তিনি এই দাওয়াতী কাজকে এক জায়গায় সীমাবদ্ধ না রেখে তা নিয়ে পুরো ভারত সফর করেন। ১৯৫৪ তে লাখনৌর গঙ্গা প্রসাদ মেমোরিয়াল হলে মানবাধিকারের উপর এক সভা হয়। ধীরে ধীরে ১৯৭৪ -এ এসে পায়ামে ইনসানিয়াত তথা মানবতার পয়গাম একটি আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। তবে কোন একটি বিশেষ কারণে তিনি একে সাংগঠনিক রূপ দেননি। এর জন্য কোন ফান্ড ছিল না। কোন কমিটি ছিল না। তিনি নিজেই ছিলেন এ আন্দোলনের ভিত্তি।

তিনি কেন করেছিলেন এ আন্দোলন? যখন বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতের বিশাল অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে দৈহিক এবং রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী পদক্ষেপ এবং জান-মাল-ইজ্জত সব কিছুতেই নিরাপত্তাহীনতা ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তিনি ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে প্রতিবেশী অমুসলিমদেরকে মানবতা ও সহমর্মিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার এবং নিজেদের নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে তাদের উপর প্রভাব ফেলার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য তাকে অনেক বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছে। তবু তিনি তার চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সামনে এগিয়ে যান ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে।

পায়ামে ইনসানিয়াতের প্রোগ্রামের ফলপ্রসূতার প্রমাণস্বরূপ এখানে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করছি। এক. আলী মিয়া র. বলেন, একবার আমি এই ধরনের সভায় বক্তৃতা করে বসতে যেতেই চারিদিক থেকে আওয়াজ আসতে থাকে, আরো বলুন! আরো বলুন! এ সময় একজন বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোক 'ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল!!' বলতে বলতে মঞ্চে গিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে থাকে, আমি জীবনে দুটি বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এক. সি.আর.দাসের বক্তৃতা। দুই. আজকের মাওলানা সাহেবের বক্তৃতা।

মাওলানা সাহেব আপনি শুধু মুসলমানদের নন, আপনার উপর আমাদেরও হক আছে। ভবিষ্যতে আপনাকে আবারো এখানে আসার জন্য কষ্ট দেব।

দুই. আসামের গোহাটি ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ডা. তারাচরণ রুস্তমী একবার বাসে ভ্রমণ করছিলেন। সমুচা কিনেছিলেন খাওয়ার জন্য। সমুচার প্যাকেটে হিন্দিতে লেখা ছিল পায়ামে ইনসানিয়াতের অঙ্গীকারনামা। তিনি এ অঙ্গীকারনামা পড়ে অভিভূত হন। পরে আলী মিয়াকে চিঠি লিখে তার প্রতিক্রিয়া জানান। জবাবে হযরত মাওলানা তার প্রেরণাকে গুরুত্ব দিয়ে তার কাছে পায়ামে ইনসানিয়াতের হিন্দিতে লেখা একটি প্যাকেট পাঠিয়ে দেন। সেগুলি পড়ে তিনি আরো অনুপ্রাণিত হন। এরপর গোপনে হযরত মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে নদওয়া আসেন। সাধারণ মেহমানের মত সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। তখন তিনি হযরতকে খুব ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেন। আসামে ফিরে গিয়ে হযরতকে পত্র লিখেন, 'আপনার বক্তৃতার দ্বারা আমি ইসলামের সে সকল বিষয় অবগত হয়েছি, আমার ধারণার বাইরে ছিল। এরপর আমি গোপনে আপনার খেদমতে হাজির হয়ে সেগুলিকে আপনার বাস্তব জীবনেও প্রত্যক্ষ করে এসেছি। আমি আপনার লেখনীর চেয়ে জীবনাচরণ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছি। এখন ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর উপায় নেই।' এরপর তিনি সপরিবারে মুসলমান হয়ে যান।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি জগদ্বিখ্যাত। ঐ ইউনিভার্সিটিতে একটি ইসলামিক সেন্টার স্থাপন করার জন্য সেখানকার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছিলেন। ভার্সিটির সাতশত বছরের ইতিহাসে যখন এ বিভাগ চালু করার প্রথম সুযোগ আসে, তখন লন্ডনে অবস্থানরত বিখ্যাত ঐতিহাসিক জনাব প্রফেসর খালীক আহমাদ নেযামী ১৯৮৩ সালে হযরত আলী মিয়াকে এ সেন্টারের উদ্বোধন করার দাওয়াত দেন।

ইসলামী বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ও সত্য সন্ধানীদের ইসলামের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে খৃস্টান শিক্ষাকেন্দ্রে এ ধরনের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে খালীক আহমাদ নেযামী সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ফারহান নেযামীর একান্ত বন্ধু সেন্ট ক্রস কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডা. ডিসি ব্রাউনিং ছিলেন অগ্রণী

ভূমিকায়। তার ইচ্ছা ছিল আলী মিয়ার মত ব্যক্তিত্ব যেন এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত থাকেন। এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করেন।

১৯৮৩ সালের ২০ জুলাই তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হিথ্রো এয়ারপোর্টে ড. ব্রাউনিং এবং ফারহান নেযামী তাকে অভ্যর্থনা জানান। ২২ জুলাই সকাল ১০টায় সভা শুরু হয়। তিনি প্রথমে আরবীতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর ফারহান নেযামী তার মূল প্রবন্ধ ইংরেজীতে ভাষান্তর করেন। ২৩ ও ২৪ জুলাই এই ইসলামিক সেন্টারের আসল বিষয় চূড়ান্ত করা হয়। ড. ফারহান নেযামীকে ডাইরেক্টর এবং ড. ব্রাউনিংকে রেজিস্টার করা হয়। ইসলামী চরিত্র বহাল রাখার জন্য নিয়ম করা হয়, কমিটির সদস্যদের মধ্যে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন বিশেষ দলের হাতিয়ার হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান ব্যবহৃত হতে না পারে।

আলী মিয়া র. এর মনে দীর্ঘ দিনের আশা ছিল, নিজে চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্য সমাজের সামনে তুলে ধরবেন। রাব্বুল আলামীনের দরবারে তার এ মিনতি পেশ করেন। পূরণ হয় তার আশা। তিনি এ সুযোগ কাজে লাগান এবং এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

১০

দ্বিতীয় ইবনে বতুতা

হযরত আলী মিয়া র. এর পুরো জীবনটাই ছিল সফরে পরিপূর্ণ। তিনি বহির্বিশ্বে ঘুরে বেড়িয়েছেন দ্বীনী দাওয়াত নিয়ে। ডাক এলেই ছুটে যেতেন এখানে-ওখানে। কাজেই তাকে দ্বিতীয় ইবনে বতুতা বললেও ভুল হবে না। নিম্নে তার কিছু অনন্য দাওয়াতী সফরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

সৌদী আরব

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস র. -এর ইন্তেকালের পর আরব বিশ্বের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক মহলের মধ্যে দাওয়াতের কাজ পরিচিত করার উদ্দেশে নিযামুদ্দীনের মারকাজ হতে আলী মিয়াকে সৌদী আরবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে হযরতের অসাধারণ পদচারণার কারণে এ নির্বাচন খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

আলী মিয়া র. ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই এ উদ্দেশ্যে জেদ্দা

পৌঁছেন। রমযান শুরু হয়ে যায়। তিনি প্রথমে ৩ মাস মদীনায় অবস্থান করেন। মদীনার উচ্চ শিক্ষিত সমাজে দাওয়াতী কাজকে পরিচয় করান। ২০ জিলকদ তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। হজ্জের পর মক্কা শরীফে আরও তিন মাস অবস্থান করে দাওয়াতের কাজকে সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি সেখানকার আরবী সাহিত্যের বড় বড় আলেম এবং জ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমর্থ হন নিজের ব্যক্তিত্বকে তাদের সামনে তুলে ধরতে ।

১৯৫০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জের জন্য তার পীর ও মুর্শিদের সাথে সৌদী আরব রওয়ানা হন। হজ্জের পর তিনি বেশ কয়েক মাস মদীনা ও মক্কা শরীফ অবস্থান করেন। সে সময় তিনি সৌদী আরবে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্মৃতি উপলব্ধি করেন। সুতরাং সকল মজলিসে মুসলমানদের জন্য পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে আত্মঘাতী ব্যাপার বলে আরব বিশ্বকে সতর্ক করেন এবং সৌদীর বিভিন্ন সভা সেমিনারে ভাষণ দেন। সৌদী রেডিওতেও হযরত আলী মিয়া র. প্রাণ খুলে আরব বিশ্বের সামনে আপন চিন্তাধারা প্রকাশ করেন।

মিশর

আলী মিয়া র. সৌদী সফরে অনুভব করেছিলেন যে, সৌদী আরবের শিক্ষিত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা মিশরের সাহিত্যকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছে। কাজেই তিনি ১৯৫১ সালের ২০ জানুয়ারী মিশর রওয়ানা হন। সেখানে প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সেখানের সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন। তার এই সফর ছিল দাওয়াতী ও শিক্ষামূলক। সেখানকার প্রসিদ্ধ আলেম, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের সাথে তিনি পরিচিত হন এবং তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বিখ্যাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমীন প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথেও মতবিনিময় করেন। তার এ সফরের ডায়রী আরবী ও উর্দুতে প্রকাশিত হয়।

সুদান

১৯৫১ সালের জুন মাসে তিনি কায়রো থেকে সুদান অভিমুখে যাত্রা করেন। ৭ জুলাই খুরতুম উপস্থিত হন। সেখানের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব উস্তাদ ইসমাঈল ও সাইয়িদ আলী মীর গণি পাশাসহ উলামা ও শিক্ষিত সমাজের

সর্বস্তরের লোকদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি সেখানের প্রতিটি প্রোগ্রামে সুদানী ভাইদের আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যত নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখার দাওয়াত এবং দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন। সেখানে তিনি ১০ দিন অবস্থান করেন।

দামেস্ক

১৯৫১ সালে তিনি সুদান থেকে দামেস্ক যান। সাহাবায়ে কেরামের মাজার আর বড় বড় ওলামায়ে কেরামের জন্মস্থান ছিল সেখানে। দামেস্কে তিনি ২৪ দিন অবস্থান করেন। এরপর সিরিয়া গিয়ে সেখানে দেড়মাস থাকেন। খুব বেশি দিন সেখানে অবস্থান না করলেও তার এ সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অল্প সময়ে তিনি অনেক কাজ করেন। দামেস্কের ওলামা-মাশায়েখ এবং সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সিরিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য কেন্দ্রসমূহ, কেন্দ্রীয় একাডেমী 'আল মাজমাউল ইলমী', ঐতিহাসিক সেই দারুল হাদীস, যেখানে বসে ইমাম নববী র. হাদীসের দরস দিতেন; সব জায়গা পরিদর্শন করেন। সিরিয়ার পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে বিশেষ মেহমান হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সফরে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসও দেখেন, যা ছিল এ সফরের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির ড. মোস্তফা সুবায়ীর দাওয়াতে ১৯৫৬ সালে সেখানকার ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ঐ সময় সেখানে ৩ মাস অবস্থান করেন। তখন দামেস্ক রেডিও তার দু'টি ভাষণ সম্প্রচার করে।

লেবানন

দামেস্ক থেকে কয়েক ঘণ্টার দূরত্ব লেবানন। দামেস্ক থাকাকালীন এ সুযোগ হাতছাড়া না করে লেবানন যান আলী মিয়া। পরিদর্শন করেন ঐতিহাসিক স্থানগুলো। ইমাম আওযায়ী র. -এর মাযার যিয়ারত করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত নওমুসলিম দার্শনিক মুহাম্মাদ আসাদের সাথেও দেখা করেন।

তুরস্ক

১৯৫৬ সালে তিনি তুরস্ক সফরে গমন করে হন। সেখানে দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন। এক রাত থাকেন হালাব শহরে। অংশগ্রহণ করেন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের এক সমাবেশে। সেখানে বক্তব্য রাখেন এবং শ্রোতাদের মধ্যে বক্তব্যের প্রভাব সৃষ্টি করেন।

হালাব থেকে তিনি তুরস্কের সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সফর করেন তিনি তুরস্কের ঐতিহাসিক শহর ইস্তাম্বুল। এছাড়া আংগুরা, মাওলানা রুমীর জন্মস্থান কওনিয়া প্রভৃতি স্থানও সফর করেন।

বাগদাদ

বাগদাদও সফর করেন আলী মিয়া। তখন হযরতের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ড. তাকীউদ্দীন হেলালী বাগদাদে ছিলেন। তিনি তার সাথে দেখা করেন। ২৩ বছরের ব্যবধানে প্রাণপ্রিয় উস্তাদের সাথে দেখা হওয়াতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। হযরত হেলালীর দৃষ্টিশক্তি কম থাকায় তিনি আলী মিয়াকে চোখে দেখতে না পারলেও তার কণ্ঠ শুনে খুব খুশি হন। তিনি তার প্রিয় শাগরেদকে দাওয়াত করেন। মাওলানা আলী মিয়া তার খান্দানের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী র. -এর মাযারসহ অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারও যিয়ারত করেন। তারপর তিনি করাচী হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

পাকিস্তান

১৯৫৩ সালের কথা। তিনি পাকিস্তান যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, কিন্তু দিল্লী থেকেই ফিরে আসেন। খতমে নবুওয়াতের আন্দোলনের কারণে সে সময় পাকিস্তানের পরিস্থিতি খারাপ ছিল। এরপর ১৯৫৪ সালে তার পীর ও মুর্শিদ মাওলানা রায়পুরী র. -এর সাথে পাকিস্তানে রমযান অতিবাহিত করেন। ঐ সময় তিনি লাহোরে সফর করেন। সেখানে তার প্রিয় বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু তিনি হযরতের যাওয়ার ২ মাস পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। অবশ্য তার অনেক বছরের সাথী মাওলানা নাযেম নদভীর সাথে দেখা করেন। আলী মিয়া যখনই লাহোরে যেতেন তখন মাওলানা নাযেম নদভী সুদূর ভাওয়ালপুর থেকে তার কাছে এসে সময় কাটাতেন।

এ শহরে আলী মিয়া তার ছাত্রজীবনের সুন্দর একটি অধ্যায় অতিবাহিত করেন। জন্মভূমির পরে লাহোর ছিল তার অনেক প্রিয় জায়গা। তার শৈশব-কৈশোর, যৌবনে ইলমের সন্ধান এবং রূহানী পিপাসা মিটানোর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এ শহরের সাথে। তারপর তিনি আরো সফর করেছিলেন সেখানে।

রেঙ্গুন

১৯৬০ সালে ১৮ ডিসেম্বর তিনি রেঙ্গুন সফর করেন। ঐ সময় রেঙ্গুনে অবস্থানরত দেওবন্দের অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ক্বারী আব্দুর রহমান সাহেবের দাওয়াতে তিনি সেখানে যান। রেঙ্গুনের মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন দ্বীনী দাওয়াতী চেতনা সৃষ্টি করা ছিল তার এ সফরের মহান উদ্দেশ্য। খুব জাঁকজমকের সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। স্বাধীন বার্মায় এর আগে কখনো কোন আলেমের জন্য এমন অভ্যর্থনার নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি সেখানে একমাস অবস্থান করেন।

কুয়েত

১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে কতিপয় বন্ধুর দাওয়াতে আলী মিয়া কুয়েত উপস্থিত হন। সেখানে তিন সপ্তাহ ছিলেন তিনি। কুয়েতের কয়েকটি বড় বড় মসজিদে তিনি জুমআর বয়ান করেন। বক্তৃতা করেন কুয়েত বেতারেও। এ বক্তৃতায় তিনি বর্তমান সভ্যতায় কুয়েত কী দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং পৃথিবীকে কী উপহার দিতে পারে, সে বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তার পরিচয় আরবের মানুষ আগেই জেনে ছিল। বিধায় তাকে কুয়েতের শাইখ, আলেম-উলামা সবাই খুব সম্মান প্রদর্শন করেন। এ সফর তিনি কুয়েতের আমীর শাইখ আব্দুল্লাহ সালেম আসাবাহ -এর নিকট গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেশ করেন। এ সম্মানিত মেহমান থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে কুয়েতের সকল মানুষ।

শ্রীলংকা

১৯৮২ সাল। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল হারাকানের অনুরোধে এবং শ্রীলঙ্কার নাযিমিয়া ইউনিভার্সিটির দাওয়াতে আলী মিয়া প্রথমবার শ্রীলঙ্কা যান। সে সময় শ্রীলঙ্কা মুসলমানদের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। সেখানের মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১২ লাখ। মোট লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪০ লাখ। শতকরা প্রায় ৯ ভাগ ছিল মুসলমান। জুমআর দিন এক ঘণ্টার জন্য সবকিছু বন্ধ থাকত। রেডিওতে দেড় ঘণ্টার মত মুসলমানদের ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় সম্প্রচার করা হত।

বাংলাদেশ

১৯৮৪ সালের ৯ মার্চ আলী মিয়া বাংলাদেশ সফর করেন। ১০ দিনের সফরে তিনি ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ঘুরে

দেখেন। ঢাকায় তিনি সোনারগাঁয়ে অবস্থান করেন। ১৬ মার্চ তিনি বায়তুল মুকাররমে জুমআর খুতবা দেন এবং বয়ান করেন। এই সফরে তিনি বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী সংগঠন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হোটেল পূর্বাণীতে দেওয়া সম্বর্ধনা সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

১৯৯৪ সালে রাবেতায়ে আদবে ইসলামীর বাংলাদেশ শাখার চেয়ারম্যান মাওলানা সুলতান যওক সাহেবের দাওয়াতে আলী মিয়া র. দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফর করেন।

মালয়েশিয়া

আলী মিয়া নদভী র. ১৯৮৭ সালের ২ এপ্রিল মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর উপস্থিত হন। মালয়েশিয়ার কিছু ছাত্র নদওয়ায় পড়াশোনা করে আরো আগেই সেদেশে তার চিন্তা-চেতনার পয়গাম ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেখানকার উলামা ও শিক্ষিত সমাজ তার রচিত বই পড়ে তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। ফলে সেখানকার ইসলামী সংগঠন এবং নদওয়ার ছাত্রদের পক্ষ থেকে মালয়েশিয়া সফরের দাওয়াত আসে। সে দাওয়াতেই আলী মিয়া মালয়েশিয়া যান।

পরের দিন মালয়েশিয়ার একটি প্রদেশ তেরাঙ্গানুতে প্রথম প্রোগ্রাম রাখা হয়। সেখানে জুমআর নামাযের পূর্বে তিনি আরবীতে বয়ান করেন। ৪ এপ্রিল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে ভার্সিটির অডিটরিয়ামে শিক্ষক, গবেষক এবং ছাত্রদের সামনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তাতে তিনি দেশের শিক্ষিত সমাজে দ্বীনের জাগরণ আনার ব্যাপারে উৎসাহ দেন।

৬ এপ্রিল কাদাহ এলাকা সফর করেন এবং নদভী ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা করেন। আল মাহাদুল আলী লিদ্দাওয়াহর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৭ তারিখ যোহরের পূর্বে মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটিতে যান এবং আছরের পর তাবলীগী মারকাযে ছাত্র সংগঠনের সম্মেলনে বয়ান করেন। ৮ এপ্রিল তিনি মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করেন। আছরের পর হিজবুল ইসলামীর মারকাযে এক বিরাট সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। একই মাসের ৯ তারিখ তিনি ভারতে ফিরে যান।

উজবেকিস্তান

আলী মিয়া র. প্রায় পুরো পৃথিবীটাই ঘুরে দেখেছেন। তবুও এশিয়ার দ্বীনী ও ইলমী প্রাণকেন্দ্র বুখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দসহ ঐতিহাসিক কিছু স্থান দেখার সুযোগ না হওয়ায় মনটা মাঝে মাঝে খুবই বিষণ্ন হত।

অবশেষে আল্লাহর অপার মহিমায় ১৯৯৩ সালে ২২ অক্টোবর দিল্লী থেকে তিনি তাশখন্দ পৌঁছেন। সেখানেও গিয়েছিলেন তিনি বিশেষ আমন্ত্রণে। লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টারের পক্ষ হতে হযরত ইমাম বুখারীর মাযারের পাশে একটি ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেন্টারের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ২৩ অক্টোবর সমরকন্দে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ মোবারক কনফারেন্সে সেন্টারের পক্ষ থেকে মাওলানাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সেখানে গিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে অনেক বড় বড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে ইমাম বুখারী র. ও তার ঐতিহাসিক হাদীস গ্রন্থের উপর আরবীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২৪ অক্টোবর তিনি ইমাম বুখারী র. -এর মাযার যিয়ারত করেন। ২৪ তারিখে ইমাম বুখারীর কর্মস্থল বুখারায় উপস্থিত হন। অনেক আলেম-উলামা ছিলেন তার সাথে । তারা সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী র.-এর মাদরাসা ও বুখারার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। ২৬ অক্টোবর তিনি সমরকন্দ হতে তাশখন্দ, এরপর দিল্লী হয়ে লাখনৌ ফিরে আসেন।

ইউরোপ

১৯৩৬ সাল। ১৯ সেপ্টেম্বর। বিখ্যাত দাঈ ডা. সাঈদ রমযানের দাওয়াতে আলী মিয়া ইউরোপ যান। এ সফরে ডা. মুহাম্মাদ ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশীকে হযরতের সাথী মনোনীত করা হয়, যিনি পূর্বে থেকে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন।

একদিন লন্ডন ইউনিভার্সিটির ইউনিয়ন হলে আলী মিয়া র. বক্তৃতা করেন। বিবিসি থেকে হযরতের সে বক্তৃতা সম্প্রচার করা হয়। লন্ডন ভ্রমণের প্রতিক্রিয়া, আরবী ভাষার উন্নতি ও সম্ভাবনা এবং মুসলিম দেশসমূহের সাথে এর সম্পর্ক- শীর্ষক এ বক্তৃতা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে সময় তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রধান ডা. আরবেরীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী এবং ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পান তিনি।

এ সফরেই তিনি স্পেন ঘুরে এসেছিলেন। তখন মুসলমানদের কয়েকশ বছর গৌরবময় রাজত্বকাল এবং তৎপরবর্তী ইতিহাসের কথা

স্মরণ করে তিনি আনন্দ ও বেদনার মিশ্র অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি কর্ডোভা মসজিদে উপস্থিত হন। সেখানে দু' রাকাত নামায আদায় করেন।

গ্রানাডা সফরকালে জুমআর সময় হয়ে গেলে তিনি কিছু আরব ছাত্রকে নামাযের দাওয়াত দেন। এরপর এক ছাত্রের কামরায় জুমআর নামায আদায় করেন। সে সময় তিনি আফসোস করে বলেছিলেন, স্পেনের মানুষদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর সুযোগ আমাদের হল না। প্রয়োজন ছিল স্পেনের ভাষা শিখে স্পেনবাসীকে বলে দেওয়া যে, "তোমরা এ দেশ থেকে মুসলমানদের বের করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছ। তোমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছ, নিজেরাই অধঃপতনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছ।" সে সময় তিনি সেখানের অবস্থা জানিয়ে ভাতিজা মুহাম্মাদ হাসানীর কাছে অনেকগুলো চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠিগুলোই পরে মাকাতিবে ইউরোপ নামে উর্দুতে ছাপা হয়েছিল। এছাড়া তিনি ১৯৬৪ সালে ইউরোপ দ্বিতীয়বার সফর করেছিলেন। ১৯৮৩ সালেও তিনি আরো একবার লন্ডন সফর করেন। ঐ সফরে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

আমেরিকা

১৯৯৭ সালে এক দাওয়াতী সফরে আলী মিয়া প্রথমবারের মত আমেরিকা যান। সেখানে তিনি মুসলিম ছাত্রদের বিখ্যাত সংগঠনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

তিনি উক্ত সম্মেলন থেকে অবসর হয়ে আমেরিকা এবং কানাডার বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে দেখেন। ঐ সময় তিনি ওয়াশিংটন, লসএঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, ফিলেডেলফিয়া, বোস্টন, শিকাগো, বাল্টিমোর, সানফ্রানসিসকো এবং কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিল এসব প্রসিদ্ধ স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। এ সফরে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত পাঁচটি ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করেন। এছাড়া জাতিসংঘের নামায হলে, টরেন্টো ও ডেট্রয়েটের জামে মসজিদে জুমআর খুতবা দেন।

সকল প্রোগ্রামের বক্তৃতায় তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সারশূন্য মোহময় প্রতারণার খপ্পরে পড়ে নিজের মহামূল্যবান ঈমান ও আমলকে না হারানোর উদাত্ত আহ্বান জানান। তার সকল বক্তৃতা আরবী, উর্দু এবং ইংরেজীতে সংকলিত হয়েছে। এসব বক্তৃতায় তিনি দু'টি বিষয় তুলে ধরেন।

এক. আমেরিকায় অবস্থানকারী মুসলমানদের নিজেদের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণের তাগিদ।

দুই. পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা, তার অসারতা ও এর সৃষ্ট সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা।

তিনি আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমেরিকায় মেশিনের ব্যবহার বাড়ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি খুব হচ্ছে, কিন্তু মানবতার অপমৃত্যু ঘটেছে। এ মাটি যদি স্বভাব ধর্মের নেয়ামত পেত, তবে দুনিয়ার ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। তিনি প্রবাসী মুসলমানদেরতে নিজেদের ঈমান রক্ষার ব্যাপারে জোর তাকিদ করেন। এসব মজলিসে মহিলাদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইসলাম পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আপনারা তার ভিত্তিস্বরূপ। আপনাদের ইসলামের উপর সঠিকভাবে চলার মধ্যেই নির্ভর করছে এদেশের লক্ষ-কোটি মানুষের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য। পশ্চিমা সভ্যতায় পরিবার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে। চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের মধুময় সম্পর্ক। আপনারা এদেশের বুকে পরিবার জীবনের মডেল স্থাপন করুন। আপনাদের জীবন ধারার নমুনা দেখে এদেশের মা-বোনেরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে অনুপ্রাণিত হবে বলে আমি আশা করি।

এ সফরে হযরতের চোখের অপারেশন করা হয়েছিল। অনেক দিন থেকেই তিনি চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন। ১৯৬৪ সালেও তিনি একবার বোম্বেতে চোখের অপারেশন করিয়েছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। অপারেশনের পরে যে ধরনের বিশ্রাম এবং সতর্কতার প্রয়োজন ছিল, বিভিন্ন ব্যস্ততায় তা হয়ে উঠেনি। ফলে চোখের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে। এরপর ১৯৬৫ সালে লাখনৌর সীতাপুরের বিখ্যাত চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেন। তাতেও তেমন উপকার না হওয়ায় আবার চোখের অপারেশন করতে হয়। ঐ সময় তিনি ২-৩ মাস হাসপাতালে ছিলেন।

এভাবেই চক্ষু সমস্যা নিয়ে চলে গিয়েছিল ১২/১৩টি বছর। শেষে ১৯৭৭ এর আমেরিকার সফরে তার চোখের অপারেশন হয়। আল্লাহর অপার মহিমায় এ অপারেশন সফল হয়। দীর্ঘ এত বছর পর তিনি নতুন

জীবন লাভ করেন। ১২ দিন হাসপাতালে ছিলেন। পূর্ণ সুস্থ হয়েই তিনি দেশে ফিরে আসেন।

মক্কা শরীফ

১৯৫১ সালে তিনি দামেস্ক থেকে মদীনা যান। কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করে তিনি মক্কায় চলে আসেন। সেখানে তিনি ৫ মাস অবস্থান করে দ্বিতীয়বারের মত হজ্জ পালন করেন।

এ সফরে সৌদী বেতার তার দু'টি বক্তব্য সম্প্রচার করেছিল। এই সফরে তিনি তায়েফ ও ওয়াদিয়ে ফাতেমা সফর করেন। সে সব স্থানে তিনি দ্বীনী, দাওয়াতী ও ইলমী প্রোগ্রাম সফল করেন।

১১

হৃদয়ের আয়নায় আলী মিয়া

সমসাময়িক উলামা-মাশায়েখের হৃদয়ের আয়নায় আলী মিয়া কেমন ছিলেন, কত প্রিয় ছিলেন, কত সম্মানের পাত্র ছিলেন তার কিছু উদাহরণ এখানে লক্ষ্য করুন-

থানবী র. এর দৃষ্টিতে আলী মিয়া

১৯ বছর বয়স থেকে আলী মিয়ার সাথে হযরতের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আলী মিয়ার বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে সেখানের আসা-যাওয়া চলতে থাকে। হযরতের সোহবতের এ সময়ে তিনি যে পরিমাণ তার আদর-স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলেন, তা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর।

একদিন আলী মিয়া হযরতের সোহবতে হাজির হলেন। হযরত তাকে দেখতে পেলেন না। একজন খলীফাকে জিজ্ঞেস করলেন, ডা. আব্দুল আলী সাহেবের ভাই কি এসেছেন? আলী মিয়া বললেন, জি হযরত! আমি এসেছি। হযরত থানভী র. বললেন, আপনি আমাকে

জানাননি কেন, আমি তো আপনার সাথে কথা বলার জন্য আগে থেকেই চিঠিপত্র লেখার কাজ সেরে রেখেছি।

থানবী র. এর কাছে আলী মিয়ার প্রেরিত সর্বপ্রথম পত্রের জবাবে হযরত শুরুতেই লিখেন, 'মুজাম্মাউল কামালাত' অর্থাৎ সকল গুণের আধার। হাকীমুল উম্মতের মত যুগশ্রেষ্ঠ আলেমের কলম থেকে এভাবে সম্বোধন পাওয়া একজন নওজোয়ান আলেমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করে।

আব্দুল কাদের রায়পুরী র. -এর চোখে আলী মিয়া

মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী র. ছিলেন তখনকার উপমহাদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখের মধ্যে অন্যতম। আলী মিয়া ছিলেন হযরতের প্রাণপ্রিয় শাগরেদ। মাওলানা মনযুর নুমানী বলেন, হযরত আলী মিয়াকে এতো বেশি মর্যাদা দিতেন যে, যা সকলের ঈর্ষা হত।

রায়পুরী র. -এর মজলিসে বেশিরভাগ সময় আলী মিয়ার লিখিত কিতাব পড়া হত। তিনি সব সময় আরেকটি নতুন কিতাবের অপেক্ষায় থাকতেন। রায়পুরী র. -এর খাদেম বলেন, একবার রমযান মাসে রায়পুরী র. -এর দরবারে অনেক আলেম-উলামা সমাবেত হন। তখন হযরত এবং শায়খুল হাদীস সাহেবের সঙ্গে আলী মিয়ার জন্যও খাট বিছানো হয়। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রায়পুরী র. বলেছিলেন, তোমরা জানো না! আলী মিয়া হলেন বিগত সময়ে বিখ্যাত মহাপুরুষদের চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি। তিনি আরও বলেন, তোমরা জেনে রাখো, আলী হলেন আমার চোখের মনি ও হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণকারী। চিঠিপত্র লিখার সময়ও তিনি তাকে 'সাইয়িদী ও মাওয়ালী' সম্বোধন করে লিখতেন।

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র.

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. আলী মিয়াকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "নির্দ্বিধায় বলছি, আপনার সাথে অন্তরের এই সম্পর্ককে আমি নিজের জন্য নাজাতের অসীলা মনে করি।" শাইখ সব সময় আলী মিয়ার চিঠির অপেক্ষায় থাকতেন।

উপমহাদেশের স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস সাহেবের সাথে ছিল আলী মিয়ার গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। পবিত্র মদীনায় তারা একসাথে থাকাকালীন সময়ে হযরত আলী মিয়ার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। প্রতিদিন তাকে ডিম ও হালুয়া খাওয়াতেন। মদীনা থেকে দূরে কোথাও

গেলে খাদেমদের বলে রাখতেন যথাসময়ে খাবার পৌঁছে দিতে। গাড়ি না থাকলে হযরতের গাড়িতে বাসায় পৌঁছে দিতে বলতেন। শাইখের আদেশেই তিনি আমেরিকায় গিয়ে চোখের অপারেশন করান। হযরতজী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর ভূমিকাগুলো পর্যন্ত লিখাতেন আলী মিয়াকে দিয়ে।

আল্লামা ইকবাল র. -এর ভাষায়

আল্লামা ইকবালের সাথে আলী মিয়া প্রথম সাক্ষাত করেন ১৯২৯ সালে তার ফুফা মাওলানা তালহা সাহেবকে নিয়ে। আলী মিয়া তখন ইকবালের কিছু কবিতার আরবী অনুবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লামা ইকবাল অবাক হয়েছিলেন তার অনুবাদের সাবলীলতা দেখে। পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্নও করেছিলেন। বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, এত অল্প বয়সে এ কাজ সম্ভব হল কিভাবে!

আলী মিয়া দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের মর্মবাণীকে "রাওযায়ে ইকবাল" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে আরবের মানুষের কাছে তাকে পরিচিত করান। এতে আল্লামা ইকবালের ছেলে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আল্লামা ইকবালও খুব খুশি হন।

আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী র.

আল্লামা সুলায়মান নদভী আলী মিয়া সম্পর্কে বলেন, আলী মিয়াকে আল্লাহ্ পাক এমন কিছু নেয়ামত দান করেছেন, যা দিয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর দেওয়া দ্বীনকে সমুন্নত করছেন। হেজাযের মত ভূমিতে তার দাওয়াতী তরবারী ঝলক দেখিয়েছে। আরবী ভাষা-সাহিত্যে তিনি এতটাই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, যা সম্পর্কে একবাক্যে বলতে হয়, এ ছিল আল্লাহপ্রাপ্ত যোগ্যতা।

শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী র. এর ভাষায়

১৯৫০ সালে আলী মিয়া তাবলীগের কাজে যে দীর্ঘ সফর করেছিলেন, এ খবর পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। দু'আ দিয়েছিলেন আল্লাহ পাক যেন তাকে উন্নতির চাবি এবং সকল অনিষ্টের প্রতিরোধক বানিয়ে দেন।

হযরত মাদানী র. -এর হাদীসের দরস এবং সোহবত থেকে অনেক উপকৃত হয়েছিলেন আলী মিয়া। শাইখ তাকে অত্যাধিক মহব্বত ও শফকতের চোখে দেখতেন।

মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী র.

মুফতী শফী র. আলী মিয়া সম্পর্কে বলেন, তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। আলী মিয়ার বরকতে নদওয়াতুল উলামা হয়েছে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইসলামী দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন আলোর দিগন্ত। তার আযমত, বিশ্বাস, গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান নদওয়াকে এনে দিয়েছে ইতিহাসের বিরল এক অসাধারণ উপহার।

হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী র.

আলী মিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হযরত মাওলানা নুমানী র.। দাওয়াত ও তাবলীগ এবং রায়পুরী র. -এর সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তার অবদান ছিল বিরাট। মনযুর নুমানী বলেন, এমন মানুষ আজ আর পৃথিবীতে নেই। আলী মিয়ার ইলম ও প্রজ্ঞায় ছিল নতুনত্বের ছোয়া। কিন্তু বিশ্বাস, দ্বীনের গভীরতা এবং জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন প্রবীণ। একটি জীবন্ত প্রদীপের নমুনা তার মাঝে পাওয়া যায়। নুমানী সাহেব আরো বলেন, ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় বলছি, পৃথিবীতে এমন মানুষ খুব কমই জন্ম নিয়েছেন, যাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তীক্ষ্ম মেধার সাথে সাথে পরিচ্ছন্ন-নিষ্কলুষ একটি অন্তরও দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী র.

হযরত দরিয়াবাদী র. তার স্বরচিত মু'আসসিরীন গ্রন্থে আলী মিয়ার ব্যাপারে লিখেছেন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাকে সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী নামে চিনলেও আমার কাছে আলী মিয়া-ই অনেক প্রিয়। আলী মিয়া মৃত নয়, জীবন্ত। তিনি জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, চলাফেরায় সাদাসিধে। তিনি বয়সে আমার ছোট হলেও চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, ইখলাস, শিষ্টাচার, খোদাভীতি, ইবাদত, বন্দেগীতে অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী। তার আত্মীয়-স্বজন স্ব স্ব স্থানে অবশ্য প্রশংসার অধিকারী, প্রত্যেকেই একেকটি নক্ষত্রতুল্য। কিন্তু সব নক্ষত্রের মাঝে আলী মিয়া হলেন এক উজ্জ্বল সূর্য।

জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ইংরেজী শিখেছিলেন প্রয়োজনমত। আরবী সাহিত্যে তো সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়ে ছিলেন। উর্দূ গদ্য-পদ্যেও অর্জন করেছিলেন অসামান্য পাণ্ডিত্য। বক্তৃতা আর গল্পেও ছিল তার অসাধারণ দক্ষতা। প্রায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখার চিন্তা করতেন, লিখেও ফেলতেন চমৎকার।

আমি স্বীয় অসিয়তনামায় লিখে যাচ্ছি, আমার শেষ নিঃশ্বাস চলে যাওয়ার পর প্রথমেই যেন আলী মিয়াকে খোঁজা হয়। তাকে পাওয়া গেলে, সেই যেন আমার জানাযার নামায পড়ায়।

মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী র.

"আপনার সম্মান শুধু নিজ ব্যক্তিত্ব পর্যন্তই থেমে থাকেনি বরং এ সম্মান ভারতীয় সকল উলামাদের জন্য বয়ে এনেছে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।"

তিনি আলী মিয়াকে ভালবাসতেন প্রাণভরে। মনে বিরাট স্থান ছিল তার জন্য সংরক্ষিত। যখন আলী মিয়া দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে গিয়েছিলেন, তখন হযরত গিলানী এই গৌরব আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।

এক চিঠিতে লিখেছিলেন, শতাব্দীর পর আপনিই সেই মহান ব্যক্তি যিনি উপমহাদেশের মধ্যে অর্জন করেছে ঐতিহাসিক সম্মান। সেই সঙ্গে আলী মিয়াকে প্রাণভরে মোবারকবাদ জানান তিনি।

মাওলানা শাহ্ ওসিউল্লাহ্ ইলাহাবাদী র.

হযরত ইলাহাবাদী র. তার খাস শাগরেদ সূফী আবদুর রব সাহেবকে বলেছিলেন, সবার অন্তর দেখেছি, কিন্তু আলী মিয়ার মত অন্তর কারও মধ্যে দেখিনি।

আলী মিয়া তার খেদমতে অনেকবার হাজির হয়েছেন। স্বয়ং আলী মিয়ার তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আমি একবার দুপুরের সময় হযরতের ওখানে পৌঁছি। তখন সবার খানা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত খবর পেয়েই নিচে নেমে আসেন। আন্তরিক মহব্বতের সাথে হাত ধরে উপরে নিয়ে যান আমাকে এবং আমার হাত ধরেই রাখেন। এর মধ্যেই খাবার গরম করা হয়। হযরত খানা খাওয়ার মাঝে মাঝে লুকমা বানিয়ে আমার মুখে দিচ্ছিলেন। আমি নিতান্তই অবাক হয়েছিলাম হযরতের ব্যবহারে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ ফুলপুরী র.

যামানার কুতুব ও বিশিষ্ট এ বুযুর্গের খেদমতে মাঝে মধ্যেই হাজির হতেন আলী মিয়া। খুব ভালবাসতেন তাকে। একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন, অনেকগুলো চিঠি পাঠিয়েছি। হযরতের কোন খবর পেলাম না। মন বড় পেরেশান। আপনি তো জানেন, আপনার সাথে আমার কেমন আন্তরিকতা। আপনার জন্য দু'আ করছি প্রাণখুলে।

হযরত বলতেন, আলী মিয়া যদি নিজেকে প্রকাশ করেন, তবে কোন পীরের মুরীদ মিলবে না। কারণ, তিনি আল্লাহর এমনই একজন কাছের বান্দা, যাকে তিনি ইলমের পর্দায় লুকিয়ে রেখেছেন।

হযরত মাওলানা ক্বারী সিদ্দীক আহমাদ বান্দবী র.

একটি চিঠিতে হযরত বান্দবী র. লিখেছেন, এই অধম আকাবিরদের সাথে মহব্বত কায়েম রেখেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এমন মুহূর্তে হযরতের যে মহব্বত আমার অন্তরে আছে, তার মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। এ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। আল্লাহ যেন একে শেষ সময় পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন।

আরেফ বিল্লাহ ডাক্তার আব্দুল হাই র.

তিনি আলী মিয়াকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সা.' -এর আরবী ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য লিখে পাঠান, আল্লাহ পাক তার ইচ্ছায় আপনাকে যে হৃদয়, যবান এবং কলমশক্তি দিয়েছেন, সত্যিই তা আল্লাহর অপার দান। আপনি দাওয়াত এবং ইশাআতের যে কাজ করছেন, তা আল্লাহ পাক কবুল করুন। আপনি আরব দেশে তাবলীগের যথেষ্ট কাজ করেছেন। কাজেই এ বইয়ের ভূমিকা যদি আপনি লিখে দেন, তবে আশা করি আরবে এর প্রচার হবে।

জাস্টিস মাওলানা তাকী উসমানী দা.বা.

মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়, এই সময় আল্লাহ পাক আলী মিয়ার থেকে এমন খেদমত নিয়েছেন, যা কোন সাহিত্যের পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপমহাদেশ পেরিয়ে আরব বিশ্বে এমনকি পাশ্চাত্য সমাজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তার দাওয়াত। এমন সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই নসীব হয়। পৃথিবীর সব শ্রেণীর মানুষের জন্য তার হৃদয়ে যে ব্যথা ও দরদ আল্লাহ দান করেছেন, সত্যিই তা বিরল।

১২

আলী মিয়ার মুখ নিসৃত বাণীসমূহ

কুরআন থেকে সবার শিক্ষা গ্রহণ

আলী মিয়া ছিলেন জগতখ্যাত একজন আলেমে দ্বীন, সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক বুযুর্গ। তার ভাষা ও বাণীতে ছিল গভীর চিন্তা-চেতনা। তিনি প্রজ্ঞা আর রূহানিয়াতের নূরে ছিলেন পরিপূর্ণ। এ মহান ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য কিছু মূল্যবান বাণী নিম্নে দেওয়া হল-

আলী মিয়া বলেন, কুরআনে কারীমের দু'টি দিক। ১. এর পঠন-পাঠন। ২. তাবলীগ বা প্রচার। কুরআনে এমন আকাইদ বর্ণিত রয়েছে, যার উপর ঈমান আনা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী। কুরআন বুঝা জরুরী। কুরআনের বিধি-বিধানকে আকড়ে ধরা আরও জরুরী।

তিনি আরও বলেন, আমার লেখার ভিত্তি হল কুরআন, সীরাতে নববী ও ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাসকে আমি কুরআনের তাফসীর মনে করি। ইতিহাসের পরে আমি সাহিত্য দ্বারা উপকৃত হয়েছি।

কুরআনে সবার জন্য সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এটি প্রত্যেকের জন্য একটি জ্ঞানের এ্যালবাম। এতে সকলের জন্য সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়

এক সাহিত্য সম্মেলনে আলী মিয়া দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১. লেখালেখি। ২. অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন। এ আলোচনায় তিনি বলেন, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করা নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। আল্লাহর দ্বীন প্রচার-প্রসারের জন্য নিজের লেখনীশক্তি ক্ষুরধার করতে হবে। তেমনিভাবে বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা উচিত। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে,

اقراء باسم ربك الذى خلق

'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা

সাইয়িদ সুলাইমান নদভী বলেন, দ্বীন প্রচারকদের উচিত সাহিত্য চর্চা করা। এতে তার মধ্যে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, যাতে সে অভিনব পদ্ধতিতে যুগোপযোগী লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। ধর্মীয় মহলে এ বিষয়টির বড় অভাব। কাজেই তারা দ্বীনী কোন বিষয়ের উপর যখন কোনও প্রবন্ধ লিখে, তাতে না থাকে কোন প্রভাব, না থাকে কোন আকর্ষণ। ফলে নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। দ্বীনের দাঈগণ দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের পর সাহিত্য শিখলে তাতে জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। উপকারও হবে অনেক বেশি। তবে এক্ষেত্রে লেখকের লেখায় নিম্নোক্ত বাস্তবতাও থাকতে হবে,

كلموا الناس على قدر عقولهم

অর্থাৎ- শ্রোতার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করতে হবে।

সাহিত্য, দাওয়াত ও দ্বীন এই তিনটির মধ্যে সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী, আল্লামা ইবনে জাওযীর মত আত্মসংশোধনকারী ওলীআল্লাহগণও সাহিত্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা তাদের উস্তাদগণের নিকট সাহিত্য পড়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহওয়ালাদের প্রভাব ও বরকত

আলী মিয়া র. বলেন, আমার বিশ্বাস এবং বিশেষ অধ্যয়ন আমাকে ইঙ্গিত করে যে, পৃথিবীর যেখানে যতটুকু দ্বীনের কাজ হয়েছে, তা আহলে হকগণ করেছেন অথবা তাদের তত্ত্বাবধানে এবং তাদের দু'আ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার বরকতে হয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের উন্নতি আহলে কুলূবদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাসাওউফ কী?

আলী মিয়া কোন এক সেমিনারে বলেন, তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধির সারসংক্ষেপ হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যা আমরা অপরিকল্পিতভাবে ও হিসাবছাড়া যেসব কাজ করি, তা পরিকল্পনাধীনভাবে করতে হবে। সবকিছুকেই হিসাবের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে কাজ চালাতে হবে। তাহলে আহলে তাসাওউফের একটা মৌলিক ভিত্তি আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হবে এবং এর গুরুত্ববোধ আমাদের অন্তরে জাগ্রত হবে। যেমন, লবণের কোন ক্ষমতা নেই লবণাক্ত হওয়ার, চিনির কোন ক্ষমতা নেই মিষ্টি অনুভূত হওয়ার এবং পানির কোন সাধ্য নেই পিপাসা মিটানোর (এসব কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন)।

তাওয়াক্কুল

আল্লাহর অদ্বিতীয় সত্তার প্রতি তাওয়াক্কুল (ভরসা) করার জন্য উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, امر بالصلوة নামাযের আদেশ বজায় রাখা ও তা কায়েমের মাধ্যমে পৃথিবীতে রিযিক বা জীবিকার অধিকার জন্মে।

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা দাঈর (দ্বীনের পথে রাহবার) প্রতি বে-রহম হন না এবং তাদের অভুক্ত রাখেন না বরং তাদের মাধ্যমে হাজার হাজার লোক রিযিক পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জঙ্গলে এক বাঘ শিকার ধরে আর হাজারো বন্য প্রাণী তা আহার করে। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া র. মাযাহেরে উলূমের শাইখুল হাদীস ও হুসাইন আহমাদ মাদানী র. -এর দস্তরখানা যারা দেখেছেন, তারা বুঝতে পেরেছেন, কিভাবে এক বাঘের শিকারে গোটা জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীকুল আহার করে।

শিশুদের প্রতি আলী মিয়া

আলী মিয়া ছোটদের উদ্দেশ্যে বলেন, শৈশবের স্বপ্নগুলো ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে বাস্তবে রূপ নেয়। শিশুকালের নিষ্পাপতাকে আল্লাহ

তাআলা অধিক পছন্দ করেন। তাই ছোটদের মনোবাসনাকে পরবর্তী জীবনে আল্লাহ তাআলা কোন না কোন অসীলায় পূরণ করে দেন।

আলী মিয়া বলেন, কাজেই আমি তোমাদের বলছি– তোমরা বড় বড় আকাঙ্ক্ষা করবে। সুন্দর ইচ্ছা করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। ইসলামের ঝাণ্ডাকে উপরে তুলে ধরবে। হবে দ্বীনের একনিষ্ঠ দাঈ। আল্লাহর ওলী ও তার মকবুল বান্দা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে।

বড় ও ছোট রোযা

তিনি বলেন, রোযার প্রকারভেদ রয়েছে। ১. বড় রোযা, ২. ছোট রোযা। বড় রোযার ইফতার রাসূলুল্লাহ সা. -এর হাতে হাউসে কাউসারের পানি দিয়ে হবে ইনশাআল্লাহ। ছোট রোযা হল বড় রোযার প্রশিক্ষণ। ছোট রোযার বিনষ্টকারী হল পানাহার। আর বড় রোযার বিনষ্টকারী হল শিরক। এর ক্ষতিকারক বস্তু হল পাপ, শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড, সুন্নতের পরিপন্থী কাজ ইত্যাদি।

যদি না থাকে এই মাদরাসা-মক্তব

মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। এখানে আকীদা পরিশুদ্ধ হয়, দ্বীন সম্পর্কে অবগতি লাভ হয়, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল জানা যায়। এ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ব্যতিত দ্বীন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমনটি স্পেনে হয়েছিল। ভারতেও স্পেনের মত নীল নকশা প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে দ্বীন-ইসলামের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ হবে। বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার এদেরকে এমনভাবে বিগড়ে দেবে যে, এরা নামে মাত্র মুসলমান থাকবে, কিন্তু কাজে কার্যতঃ অন্তঃসার শূন্য হয়ে যাবে।

অপূর্ব শান্তি বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতে

বুযুর্গদের সোহবত বা সৎলোকের সংশ্রবের কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় রাসূলের সাহাবীদেরকে সাহাবী না বলে আউলিয়া, সূফী বা অন্য কোন পদবীতে তাদের ভূষিত করা হত। অনেক তাবিঈ যিকির, তাসবীহ ও নফল ইবাদতে বহুদূর এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু তারা সাহাবীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেননি। সোহবতের দ্বারা অল্প সময়ে যে কাজ হয়, তা প্রখর মেধা ও একনিষ্ঠ অধ্যয়নেও হয় না।

সোহবতের দ্বারা হৃদয়রাজ্যে আকুলতা-ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, অন্তরে নূরের জন্ম হয়। এর দ্বারা কোন জিনিসের গুরুত্ব, মর্যাদা-মূল্য সম্পর্কে

অবহিত হওয়া যায়, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এটি অপূর্ব এক প্রদীপ সমতুল্য। আর প্রদীপ থেকে প্রদীপে যেমন আলো সঞ্চালিত হয়, তেমনি হৃদয় থেকে হৃদয়ে আলোর গতি সঞ্চালন হয়।

সবচেয়ে বড় উপকার

একটি প্রশ্নের জবাবে মাওলানা আলী মিয়া বলেন, বুযুর্গ ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে, মানুষ নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করতে শেখে এবং অনুশোচনার সুযোগ পায়। বুযুর্গদের দরবারে গিয়ে নিজেদের অবস্থা দেখে লজ্জিত হয়। তাদের চরিত্র মাধুরী, ইবাদত, রূহানিয়্যাত দেখে নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও ঘাটতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেছিলেন, নেক লোকের সাহচর্যে থাকার বিষয়টি তো সরাসরি ওহীর দ্বারা প্রমাণিত।

একাল-সেকাল

আগের যুগের আলেমগণ বুযুর্গ ব্যক্তিদের সোহবতে থাকা জরুরী মনে করতেন। তাদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করাকে অত্যন্ত লাভজনক মনে করতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ প্রচলন উঠে গেছে। এমনকি বর্তমানে ছাত্ররা তাদের উস্তাদদের নিকট পর্যন্ত বসতে চায় না।

এই ব্যক্তিত্বের পেছনে

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অনেক অনুগ্রহ (জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব) দান করেছেন। এর পিছনে চারটি জিনিসের ভূমিকা রয়েছে। ১. আমার পিতার ইখলাস, ২. মায়ের দু'আ, ৩. ভাইয়ের তত্ত্বাবধান, ৪. উস্তাদ ও শাইখদের আন্তরিক নেক নজর।

আজকালের মানুষ

আল্লাহ্র নিকট ইখলাস (নিয়তের পরিশুদ্ধতা) এবং মানুষের নিকট সদাচরণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। প্রবাদ রয়েছে, সচ্চরিত্র তো আল্লাহওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য। আজকাল মানুষ কাশ্‌ফ ও কারামত দেখার জন্য বুযুর্গদের নিকট গমন করে অথচ উচিত ছিল তাদের চরিত্র মাধুরী ও সদাচরণ দেখার জন্য তাদের কাছে গমন করা।

কেন এই সামাজিক অনিষ্টতা?

আলী মিয়া প্রায়ই বলতেন, বর্তমান যুগে সামাজিক জীবনে অনিষ্ট এবং বিভ্রান্তির কারণ খারাপ নিয়ত নয় বরং নিয়তহীনতা। আলী মিয়া

কোয়েটার সেই ব্যক্তির ঘটনা বয়ান করছিলেন, যিনি রোযা রেখে ইফতার করার সময় বলতেন– আমি তো রোযা রাখি এ জন্য যে, ইফতারীর সময় খাবার এমন সুস্বাদু লাগে, যা অন্য সময় লাগে না।

বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের একাত্মতা

বিশ্বাসে একনিষ্ঠতা, উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতায় একাত্মতা কাজে অভাবনীয় সুফল বয়ে আনে। উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস এক্ষেত্রে এমনই হয় যে, তা অস্থিমজ্জায়, শিরা-উপশিরায় মিশে একাকার হয়ে যায়। এর মধ্যে আকর্ষণ ও স্বাদ সৃষ্টি হয়। তাই উদ্দেশ্যের সাথে কেবল সংশ্লিষ্টতাই যথেষ্ট নয়, বরং এর প্রতি থাকতে হবে প্রবল আকর্ষণ।

ইখলাস ও খাঁটি নিয়ত বৃথা যায় না

তিনি প্রায়ই বলতেন, এটি বারবার পরীক্ষিত যে, মুখলেস ব্যক্তির পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না। মুখলেস ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সেই নৌকার মাঝির মত, যার নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের কবলে পড়ায় তীরের দর্শকদের মন ভয়ে দুরু দুরু কাঁপতে থাকে। কিন্তু দেখা যায়, ডুবতে ডুবতে সে নৌকা তীরে উঠে আসে। আর গায়রে মুখলেস ব্যক্তিদের নৌকা তীরে পৌঁছার আগেই ডুবে যায়। আমার দীর্ঘ জীবনে আমি লক্ষ্য করেছি- কোন কোন ব্যক্তির খ্যাতি ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ তার জীবদ্দশাতেই অথবা তার মৃত্যুর পরপরই সে খ্যাতি বিলীন হতে শুরু করেছে। আর যদি কোন পর্যবেক্ষক বা বিশ্লেষক তার সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুরু করে তবে তার প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতার অপমৃত্যু ঘটে।

অপরদিকে কোন অপ্রসিদ্ধ, নির্জনাবাসী ব্যক্তি নীরবে কল্যাণকর কাজ করতে থাকে আর তার ইখলাসপূর্ণ কাজ তার জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি লাভ না করলেও হঠাৎ কোন কারণে তার খ্যাতি এমনভাবে জ্বলে উঠে, যার ফলে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ ও প্রচেষ্টাগুলো তাকে পৃথিবীতে অমরত্ব দান করে। তার কবুলিয়াতের জন্য মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর তরফ থেকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা দেখে বিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়, থমকে দাঁড়ায়, থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

কুসংস্কার দূর করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

সমাজের কুসংস্কার ও কু-প্রথা দূর করা একটি বড় দায়িত্ব। আলী মিয়া বলেন, আমি তাবলীগওয়ালাদের বলি, তারা যেন এ কাজটি

কার্যতালিকায় না রাখলেও মাথায় রাখেন। সুযোগ হলে এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে হবে। যৌতুক, লটারী, জুয়া, ঘুষ ইত্যাদি এবং এ জাতীয় সকল ক্ষতিকর লেনদেন, যা সামাজিক জীবনে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তা থেকে নিষেধ করবে। এভাবে লোকদের ইসলাহ্ করতে হবে। তাহলেই তাবলীগের দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হবে।

বেতনবিহীন শিক্ষাদান

আলী মিয়া বেতন না নেওয়ার বিষয়ে বলেন, আমাদের তাবলীগী দাঈগণ অনেক সময় সফরে থাকেন। আমি মাওলানা ইলিয়াস র.কে একবার বললাম, আমি বিনা বেতনে পড়াতে চাই। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের পূর্বসূরী উলামার মধ্যে এ রীতি নেই। তাই বেতন নেওয়া উচিৎ। এতে ভিন্ন উপকার আছে। পরে একদিন মাওলানা ইলিয়াস র. আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বেতন কত? আমি জবাবে বলেছিলাম, পঞ্চাশ রূপী। তিনি তখন বলেছিলেন, মৌলভী সাহেব! এমন হাজারো পঞ্চাশ রূপী আপনার চাকর-নওকরের চরণে উৎসর্গ হোক। এরপর থেকে আমি বেতন নেওয়া ছেড়ে দিলাম।

নেক দৃষ্টির প্রভাব

একবার দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে মাওলানা আলী মিয়া নেক দৃষ্টি বা তাওয়াজ্জুহের ফায়দা ও প্রভাব প্রসঙ্গে হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ র. -এর তাওয়াজ্জুহ সম্পর্কে অনেক অনেক প্রশংসা করেছিলেন। তারপর বললেন, উত্তম তাওয়াজ্জুহ হল, যার মাধ্যমে মানুষ ফরজসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নামাযে বিশেষ স্বাদ অনুভব করে। আর যে তাওয়াজ্জুহের প্রভাবে কারামত ও কাশফ বেশী বেশী হয়, সেটা গ্রহণযোগ্য তাওয়াজ্জুহ নয়।

মা'মুলাতের পাবন্দী করা

যথাসম্ভব মা'মুলাত বা শাইখের নির্দেশিত আমলসমূহ যথাযথ পালন করা উচিৎ। এতে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় এবং কাজে বরকত হয়।

কিছু দায়িত্ব

অলী আল্লাহ ও খোদাভীরু আলেমদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত। পিতা যদি সন্তানের প্রতি বিনা কারণে নাখোশ হন, তবে পুত্রের জন্য এটাও ক্ষতির কারণ। সর্বদা লক্ষ্য রাখবে, তোমার কাজের দ্বারা যেন তারা সামান্য কষ্টও না পান। তিনি তার এক

শাগরেদকে বলেন, নিজের জন্য মুস্তাহাবকেও জরুরী মনে করবে আর অন্যের ব্যাপারে ফরয আদায় করলে তা-ই যথেষ্ট মনে করবে।

তিনি বলেন, জীবন এমন হওয়া উচিত যেন অন্যের উপর তার সুপ্রভাব পড়ে। এটা ইসলামের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে হতে পারে। নিজের আমল, আকীদা, চরিত্র, সদাচরণের মাধ্যমেও হতে পারে। অবশ্যই এমন কাজ করবে, যা পথ প্রদর্শন করে, আকৃষ্ট করে ও তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

জীবন যাপনের ধরন

জীবন যাপন এমন হতে হবে, যেন তা অন্যের চলার পথে মশালের কাজ করে এবং তা ইসলামের দাওয়াতের কাজ দেয়। যাতে থাকবে এমন চৌম্বকশক্তি, যা মানুষকে আকৃষ্ট করবে কল্যাণের পথে, নাড়া দেবে তাদের সামাজিক ও সম্মিলিত জীবনকে। যখন এই জীবন এমন শক্তিসম্পন্ন হবে, যাতে গণজীবনে বিপ্লব আসে, ইসলাম তখন দুনিয়ার বুকে চমকে উঠবে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী র. আজমীর শরীফে এলে লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হয়েছিল। সাইয়িদ আলী হামদানী কাশ্মীর গেলে সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

অনুরূপভাবে সাইয়িদ আহমদ শহীদ এবং তার সাথীগণ যেখানেই উপস্থিত হয়েছেন সেখানেই হিদায়াতের আলো জ্বলে উঠেছে। বহু সংখ্যক লোক তাদের হাতে তওবা করেছে।

পবিত্র হিজাযের সঙ্গে হৃদ্যতা

পবিত্র আরবভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। সাইয়িদ আহমদ শহীদ যখন হিজাযে পৌঁছলেন এবং দূর থেকে বাইতুল্লাহ নজরে পড়ল, তখন তিনি শুকরিয়া আদায়ের জন্য দু' রাকাত নামায পড়লেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী বলেন, শরীর ভারতে আর অন্তর হিজাযে- এটা শরীর হিজাযে আর অন্তর ভারতে থাকার চেয়ে উত্তম।

একজন বুযুর্গ ব্যক্তি এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, জান্নাতুল বাকী (মদীনার কবরস্থান) থেকে কতিপয় মুর্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে আর অন্যস্থান থেকে কতিপয় মুর্দাকে জান্নাতুল বাকীতে আনা হচ্ছে। তিনি অপসারণকারীদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? স্বপ্নে তাকে জবাব

দেওয়া হল, যাদেরকে অন্যত্র নেওয়া হচ্ছে, জীবিত থাকতে তাদের শরীর আরবভূমিতে ছিল, কিন্তু অন্তর ছিল অন্যত্র। তাই তাদেরকে জান্নাতুল বাকী থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর যাদেরকে আনা হল, তাদের শরীর অন্যত্র ছিল বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল পবিত্র হিজাযে, তাই তাদেরকে জান্নাতুল বাকীতে আনা হচ্ছে।

নিজের দোষ আর অন্যের গুণ দেখা

সকল মানুষের উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা, সংশোধন করা এবং অপরের ভাল গুণগুলো বর্ণনা করা। কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে এর উল্টো। মানুষ নিজের সাফাই গাইতে ব্যস্ত এবং অপরের দোষত্রুটি ধরতে উৎসাহী আর এটা সকল অনিষ্টের মূল।

যিকিরের প্রভাব সৃষ্টি করার তরীকা

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হযরত অন্তরে আল্লাহর স্মরণ কিভাবে আনব? তিনি জবাবে বললেন, আমি এখনই আপনাকে তা বলে দিচ্ছি। নিশ্চিন্তভাবে বসে অনুচ্চ স্বরে তাসবীহের দানা আঙ্গুলের উপর রেখে পড়বেন এবং মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করবেন, যেমন ঘড়ির কাটা চলে। এভাবে কণ্ঠধ্বনি ভারী হয় এবং কোন কিছু করা ছাড়াই উচ্চস্বরে যিকির হতে থাকে। মূলতঃ মুমিনের কলবে আল্লাহর স্মরণ প্রথম থেকে পূর্ণ আছে। এখন জরুরী অন্তরের কাটায় ঘড়ির মত নাড়া দেওয়া।

বিনয়, অনুগ্রহ ও ইখলাস বুযুর্গদের বৈশিষ্ট্য

হযরত মাওলানা ইলিয়াস র. -এর বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তার দ্বীনী প্রেরণা ও খালেছ নিয়ত। বুযুর্গদের মধ্যে বিনয়, ইহসান, কৃতজ্ঞতা এবং ওয়াদা পালনের অভ্যাসের আধিক্য থাকে। ইহসান বা অনুগ্রহ বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। সকলের উচিত অন্যের প্রতি অনেক অনেক ইহসান করা। উন্নত চরিত্রের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বুযুর্গদের প্রতি, শাইখদের প্রতি, উস্তাদদের প্রতি, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর প্রতি এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি ইহসান করা উচিত।

প্রবাদতুল্য সুন্নাতের অনুসারী

হযরত শাহ আলামুল্লাহ র. সুন্নতের এক অনন্য অনুসারী ছিলেন। হযরতের নামে একটি এলাকার নামকরণও করা হয়েছে। বাদশাহ

আলমগীর এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, রাসূল সা. ইন্তেকাল করেছেন। বাদশাহ তার সভাসদকে এই তারিখটি নোট করতে বললেন। তাবীর করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেল, ঐ রাতে হযরত শাহ আলামুল্লাহ র. ইন্তে কাল করেছেন।

তিনি বলেন, শাহ আলামুল্লাহ র. মুজাহাদায় ছিলেন এলাকার প্রবাদতুল্য। শৈশবে আমাদের কারো ঘরে খাবার না থাকলে শিশুদের শেখানো হত- আমাদের ঘরে আজ খাবার নেই বলো না বরং বলবে আমাদের ঘরে আজ শাহ আলামুল্লাহ মেহমান হয়েছেন। যুহদের ব্যাপারে মানুষ তাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করত।

কথা কম বলতে উৎসাহ প্রদান

বেশি কথা বলার দ্বারা মন-মস্তিষ্ক ও শিরা তিনটিরই শক্তি ব্যয় হয় এবং তিনটি অঙ্গই প্রভাবিত হয়। এতে রূহানিয়াতের ঘাটতি ঘটে। এজন্য খানকাগুলোতে কম কথা বলার জন্য উৎসাহিত করা হয়। মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী র. বলতেন, আমার এখানে এসো, যত পার পানাহার কর এবং থাকো অসুবিধা নেই। কিন্তু কথা কম বলবে।

চারটি গুণের প্রয়োজনীয়তা

লাহোরের সেমিনারে মাওলানা দাউদ গজনবী ও মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফের বক্তৃতার উপর আলোচনা করতে গিয়ে আলী মিয়া বলেন, আহলে সুন্নাহদের জন্য চারটি গুণ থাকা একান্ত অপরিহার্য। ১. একত্ববাদে খাঁটি বিশ্বাস। ২. সুন্নতের ঐকান্তিক অনুসরণ। ৩. আল্লাহর সাথে খালেছ সম্পর্ক। ৪. জিহাদের চেতনা।

মুসলমানের সম্পর্ক

এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, কল্যাণ ও অকল্যাণ দুটি বিপরীতধর্মী জিনিস। এ দু'টি কখনো একত্রিত হতে পারে না। মুসলমানদের সম্পর্ক কল্যাণের সাথে, অকল্যাণের সাথে নয়।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. দুনিয়াকে কল্যাণের পয়গাম শুনিয়েছিলেন। যখন আল্লাহর বাণী শেষনবীর মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তখন আমাদের দায়িত্ব হল, দুনিয়াকে বিবাদ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

দ্বীনের দাওয়াত

স্পেনের কথা উল্লেখ করে মাওলানা আলী মিয়া বলেন, আমি যখন স্পেনে পৌঁছি তখন মনে হয়েছে, সে স্থান রূহানিয়াতে সুরভীতে সুরভিত। কেননা সেখানে বড় বড় আওলিয়া ও মাশাইখ জন্মগ্রহণ করেছেন ও শুয়ে আছেন। কিন্তু বড় আক্ষেপ! আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান এবং আলেম-উলামার এ নিয়ে কোন চিন্তা নেই যে, স্পেনেও ইসলাম প্রচার হতে পারে। এমন হাতেগোণা কয়েকজন লোকও নেই, যারা স্পেনের ভাষা শিখে সেখানে যাবে।

১৩

রচনাবলী

লেখক আলী মিয়া

১৬ বছর বয়সে মিশরের বিখ্যাত পত্রিকা 'আল মানার' -এ তার প্রথম আরবী লেখা প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে এ কলমকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। লিখে গেছে অবিশ্রান্তভাবে। আলী মিয়া প্রথমে কয়েক বছর আরবীতেই অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখেছেন। সে আরবী লেখাগুলো উর্দুতে তরজমা হতে থাকে। মূলতঃ আরবী রচনাবলীর জন্যই তিনি নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন পূর্ণভাবে।

আলী মিয়া র. একজন লেখক হিসেবে সারা বিশ্বে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার কলমকে কবুল করেছিলেন। লেখার মধ্যে নূর আর বরকত ঢেলে দিয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর যাবৎ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা থাকা সত্ত্বেও তার লেখালেখি চলে ছিল অবিশ্বাস্যভাবে। এ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কী-ই হতে পারে?

আরবী ভাষায় রচিত তার কয়েকটি গ্রন্থ আরব দেশের বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার উর্দু রচনার সংখ্যা ১৬৫ এবং আরবী রচনার সংখ্যা ১৭৬। এছাড়া তার অধিকাংশ রচনা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, তুর্কি, বাংলা, তামিল, মালয়ী, গুজরাটিসহ আরও অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

আলী মিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, 'মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন'। ৩০ বছর বয়সে তিনি আরবীতে এ গ্রন্থখানি রচনা করেন, যা পরে 'ইনসানি দুনইয়া পর মুসলমানুকা উরুয ওয়া যাওয়াল কা আছর' নামে উর্দুতে অনূদিত হয়। এটি এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। শুধু তাই নয় বরং এ গ্রন্থে রয়েছে মুসলিম উম্মাহর ইসলামী পুনর্জাগরণের সকল নির্দেশনা। যুগের পরিবর্তনে মুসলিম মিল্লাতের উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক বর্ণনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে পুরো ইসলামী দুনিয়ায় যেন এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। রাসূল সা. -এর পৃথিবীতে আগমনের সময় পৃথিবীর অবস্থা কী ছিল, ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্বভার তিনি নিজের হাতে কিভাবে নিয়েছিলেন এবং তা বিশ্ব সভ্যতার উপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, এরপর এই নেতৃত্ব কিভাবে শেষ হয়ে যায় ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে।

প্রিয় গ্রন্থ

একবার এক মজলিসে আলী মিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হল যে, আপনার বইসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কোনটি। তিনি বলেছিলেন, মর্যাদার দিক দিয়ে প্রিয় গ্রন্থ 'নবীয়ে রহমত'। কিন্তু যে গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামী দুনিয়ায় আমার পরিচয় হয়েছিল এবং দাওয়াতী কাজ করার মসৃণ ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল সেটি হচ্ছে, 'মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন'। এ গ্রন্থখানি সারা দুনিয়ায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। আরব দুনিয়া, ইসলামী দুনিয়ার সবস্থানেই আলোচ্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে। এমনকি পাশ্চাত্যের বিখ্যাত লেখক লন্ডন ইউনিভার্সিটির মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর বেকনাঘস বলতে বাধ্য হন যে, এ শতাব্দীতে ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য যে সব প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, এ গ্রন্থখানি তার নমুনা এবং তা ঐতিহাসিক দলীল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

একটি ঘটনা

'মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন' -এর পাণ্ডুলিপি তৈরীর পর গ্রন্থটি প্রকাশ করার মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। আর কোন প্রকাশনা সংস্থাও গ্রন্থটি প্রকাশ করার আগ্রহ দেখায়নি। তিনি চিন্তিত, খুবই পেরেশান হলেন। তখন মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন তিনি। সেখানকার কিছু প্রকাশনার সাথে কথা বলেও কোন ফল পেলেন না। ভাবতে থাকেন কী করবেন? অবশেষে আল্লাহর ঘরের দরজায় হাজিরা দেন। হেরেম শরীফে মুলতাযিমে গিয়ে অন্তরের সকল মিনতি আল্লাহর কাছে খুলে বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি গায়েবীভাবে গ্রন্থটির প্রকাশের সকল ব্যবস্থা করে দেন। এত সুন্দরভাবে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল, এরূপ আর কোন বইয়ের বেলায় হয়নি। এর গ্রহণযোগ্যতার অবস্থা ছিল এমন যে, ১৯৮২ সালে কুয়েতের দারুল কলম এ গ্রন্থখানির এক লাখ কপি ছাপার সাথে সাথে সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার আশি হাজার কপি ক্রয় করে। রিয়াদের মাকতাবাতুল হারাম তার বারো হাজার কপি কিনে নেয়। মিশর, বৈরুত, সিরিয়া থেকেও এ বইটির ১৫টি এডিশন বের হয়। ভারতে এবং পাকিস্তানে ১২টি করে সংস্করণ উর্দুতে বের হয়েছে। ইংরেজীতে ছয়টি এবং তুরস্কের আংকারা থেকে তুর্কিতে, ইরানের কোম থেকে ফার্সীতে, প্যারিস থেকে ফরাসীতে ছাপা হয়েছে। আরো অন্যান্য ভাষায়ও এর ভাষান্তর হচ্ছে। বাংলাতেও হয়েছে এর অনুবাদ।

পরম করুণাময়ের কাছে গ্রন্থখানা কবুল করিয়ে নেওয়ার পর আলী মিয়া মিশরের এক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশক 'লাজনাতুত তা'লীফ ওয়াত তরজমা ওয়ান্নাশর' এর সভাপতি ডক্টর আহাদ আমীনের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সবাই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে খুশি হন এবং আলী মিয়ার সাথে এ গ্রন্থ প্রকাশের চুক্তি নেন। তার জীবনের অনেক অনন্য একটি খুশির দিন ছিল, যেদিন মুহাম্মাদ রাবে হাসানী তাকে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের চিঠি পাঠান।

স্মরণীয় একটি ঘটনা

১৯৫০ সালে 'মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন' -এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক বছর গত হয়ে যায় তখনও গ্রন্থটি

দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। ১৯৫১ সালের শুরু। হেজাযের সফরের শেষ সময়। মিশর, সিরিয়া ও সেখানের লেখকদের সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে ভিসার জন্য জেদ্দার সিরীয় দূতাবাসে গেলেন। ভিসা নিয়ে তিনি সিরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাত করেন। রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন সাহিত্যানুরাগী মানুষ। তিনি মিশরী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আলী মিয়ার সাথে। এক পর্যায়ে বলেন, ভারতীয় আলেমদের গ্রন্থসমূহে যে রূহানিয়াত ও প্রাঞ্জলতা আছে, মিশরীয় আলেমদের গ্রন্থে তা পাওয়া যায় না। কিছুদিন পূর্বে আমি মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানের এক লাইব্রেরীতে 'মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন' নামে একটি বই দেখলাম এবং পড়ে খুবই অভিভূত হলাম। এ কথা শুনতেই আলী মিয়ার হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়। তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে রাষ্ট্রদূতকে বললেন, আপনার কাছে কি বইটি আছে? রাষ্ট্রদূত বইটি এনে আলী মিয়ার হাতে দেন। আলী মিয়া কয়েকদিনের জন্য বইটি ধার নেন। বইটি দেখে পড়ে লেখক হিসেবে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন।

একটি বই

একবার আলী মিয়া তার মুর্শিদ হযরত রায়পুরী র. -এর সাথে ফজরের নামাযের পর হাঁটছিলেন। ঐ সময় তাদের সাথে একজন অমুসলিম পণ্ডিত লোকও ছিলেন। হযরত রায়পুরী র. তাকে বলছিলেন, ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হল, ইসলামের যে সময় যে ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ পাক তখন তেমন লোকই পাঠিয়েছেন। যখন যে ধরনের ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে, তার মোকাবেলা করার জন্য তিনি তেমন মানুষই সৃষ্টি করেছেন। রায়পুরী র. এর কথাগুলো আলী মিয়া খুব মনোযোগের সাথে শুনলেন। মনে মনে পরিকল্পনা করলেন, এ বিষয়ের উপর অবশ্যই কিছু লিখবেন।

শুরু করলেন লিখা। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে শেষ হয় তার এই লিখা। "তারিখে দাওয়াত ও আযীমাত" নামে এই বইটিতে প্রথম শতাব্দীর বিশেষ ব্যক্তিত্ব হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. -এর সংস্কার কর্ম থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন মনীষীর সংস্কারমূলক ও বিপ্লবী চিন্তাধারার কার্যক্রম পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালের আযমগড়ের দারুল মুসান্নিফীন থেকে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে

এরই ধারাবাহিকতায় হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. পর্যন্ত সর্বমোট পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষায়ও এ বইটি 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' নামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু সাহিত্য রচনায় আলী মিয়া র.

হযরত আলী মিয়ার বেশ কয়েক বছর নিচের ক্লাসগুলোতে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংকলিত 'আল কেরাআতুর রাশেদা' সিরিজ পড়ানোর সুযোগ হয়েছিল। বইটি ভাষাগত শুদ্ধতা, পাঠের নিয়মনীতি, শিশুদের পছন্দ, বয়স ও সাধারণ জ্ঞান সর্বদিক থেকে সফল এবং দ্বীনী রূহ ও চারিত্রিক শিক্ষা থেকেও মুক্ত ছিল না, কিন্তু এটি মূলতঃ মিশরের (যাদের একটি বড় অংশ খৃস্টান ও কিবতী) জন্য সংকলন করা হয়েছিল।

তাতে ঘটনাক্রমে এবং অনেকটা প্রয়োজনে আঞ্চলিক ও দেশীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি দর্শনের প্রভাব ছিল। বেশিরভাগ পাঠই মিশরের আশেপাশের অঞ্চল, প্রাচীন নিদর্শন ও মিসরের ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কিত।

হযরত আলী মিয়া বলেন, ধীরে ধীরে আমার অন্তরে এ খেয়াল আসে যে, এ অঞ্চলের শিশুদের চাহিদা পূরণের জন্য আরবী শিশু পাঠ্যের নতুন সিরিজ লেখা প্রয়োজন। ভাই সাহেবের উপস্থিতি, সাইয়িদ সাহেবের স্নেহ এবং সে সময়ে দারুল উলূমের মুহতামিম মাওলানা ইমরান খান সাহেব বর্তমান থাকায় পুরোপুরি নিশ্চয়তা ছিল যে, যদি এ সিরিজ তৈরী হয়ে যায়, তবে সিলেবাসভুক্ত হতে সময় লাগবে না। সুতরাং তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করে দেন। সম্ভবত ১৯৪৪ সালের কাছাকাছি সময়ে রচনার কাজ শুরু হয় এবং দু' বছরের মধ্যেই তার তিনটি খণ্ড তৈরী হয়ে যায়।

বইতে খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে কোন পাঠই দ্বীনী উপদেশ থেকে শূন্য না হয় এবং এ থেকে যেন কোন দ্বীনী বা আখলাকী সুফল বের হয় অথবা কোন দ্বীনী শিক্ষা ও শিষ্টাচারের নির্দেশনা পাওয়া যায়।

কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফাল রচনা

হযরত আলী মিয়া যে খেদমত ও আল্লাহর তাওফীকের সবচেয়ে বেশি শুকরিয়া আদায় করতেন এবং যাকে মাগফেরাতের ওসীলা ও আখেরাতের সম্বল মনে করতেন তা হল, কাসাসুন নাবিয়্যীন সিরিজ। দারুল উলূমে কামেল কিলানী রচিত 'হিকায়াতুল আতফাল' সিরিজ পাঠ্যভুক্ত ছিল। সে সময় আরব বিশ্বের সর্বত্র তা জনপ্রিয় ও সমাদৃত

ছিল। হযরত মাওলানা বলেন, 'আমাকেও এ কিতাব পড়াতে হয়েছে। আমাকে এর জন্য খাঁটি প্রগতিবাদী হয়ে যেতে হত। বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি সামনে নিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা পড়াতে হত। কিন্তু মাখদুম ও মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (যার দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ ও অনুভূতি আলেমদের গর্বের বিষয় ছিল) বিশেষভাবে এদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে আমার কাছে লিখিত এক পত্রে উক্ত বই পাঠ্যভুক্ত হওয়াতে সমালোচনা করেন।

এ কাজ সম্ভবত ১৯৪৩-৪৪ সনের মাঝামাঝিতে শুরু হয়েছিল এবং এর ধারাবাহিকতা সফরে ও নিজ গৃহে অবস্থানকালে ট্রেনে, রাস্তার পার্শ্বে, গাড়ির অপেক্ষায় থাকাকালে, লাহোর, সোহাওয়া ও নিযামুদ্দীনে অবস্থানকালে চলাফেরার মানসিক বিক্ষিপ্ততার অবস্থাতেও চালু ছিল। আল্লাহর তাওফীকে এক সময় তা সুসম্পন্ন হয়।

হযরত আলী মিয়া বলেন, এটি রচনার কাজ শুরু করার পর মনে হত, আল্লাহ তা আমার জন্য এ কাজ এতই সহজ করে দিয়েছেন যে, যখনই চাইতাম সাধারণ কথাবার্তা বলার মত অনায়াসে লিখতে পারতাম।

পুরো বইতে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখা করা হয়েছে।

এক. বইটি কুরআনের ভাষায় লেখা এবং স্থানে স্থানে কুরআনের আয়াত অলংকাররূপে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই. শব্দভাণ্ডার কম, কিন্তু পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করে স্মৃতিতে অংকন গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

তিন. ইসলামের বুনিয়াদী আকাইদ (তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত) এর শিক্ষা ও আলোচনাও এসে গেছে।

চার. ঘটনা বিশদভাবে লেখা হয়েছে এবং তাতে এমন পথনির্দেশনা রয়েছে, যাতে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা, তাওহীদ ও ঈমানের মুহাব্বত ও আম্বিয়া আ. এর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা শিশুদের মনের গভীরে গেঁথে যায়।

এ কিতাবে শিশুদের আকীদা-বিশ্বাস শুদ্ধ করা ও তাদের মন-মানসিকতা গড়ে তোলার খোরাকও আছে। তাই এর প্রতি মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী র. -এর দৃষ্টি পড়ে সর্বপ্রথম। তিনি এর উপর মতামত পেশ করতে গিয়ে বলেন, 'এ কিতাবের মাধ্যমে শিশুদের ইলমে

কালাম হাসিল হয়ে গেছে।' মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব তার ভূমিকায় লেখেন, 'এ কিতাবে ভাষা সাহিত্য ও দ্বীনকে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন নখ গোশতের সাথে মিশে থাকে।' মাওলানা আব্দুল মাজেদ র. এ কিতাবের এত মূল্যায়ন করেছিলেন যে, তিনি চাইতেন হযরত মাওলানা সব কাজ ছেড়ে এর পিছনে সময় ব্যয় করুন। কিন্তু ৩য় খণ্ড (হযরত মূসা আ. সম্পর্কিত) শেষে এ ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়।

কিতাবের দ্বিতীয় এডিশন যখন মিশর থেকে ছাপা হয়েছিল, তখন হযরত মাওলানা চেয়েছিলেন, সাইয়্যিদ কুতুব যেন এর ভূমিকা লিখে দেন। সুতরাং তিনি এর ভূমিকা লেখেন এবং বইটির প্রাণখোলা প্রশংসা করেন।

এ কিতাব মিশরের পর বৈরুতের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা 'মুআসসাতুর রিসালাহ' -এর পক্ষ থেকে কয়েক হাজার কপি প্রকাশিত হয় এবং সৌদী আরবের বহু প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যভুক্ত হয়। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বহু মাদরাসা, স্কুল ও কলেজে আরবী শাখায়ও এটি পাঠ্যভুক্ত হয়।

মাওলানা আব্দুল মাজেদ সাহেবের মত ব্যক্তিত্বের তাগাদা, অনুরোধ এবং কিতাব সম্পর্কে তার উঁচু দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও প্রায় ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের পর ৪র্থ লেখার এবং অবশিষ্ট নবীদের সম্পর্কে বিশেষতঃ খাতামুন্নাবিয়্যীন সা. -এর মোবারক জীবনচরিত সম্পর্কে (আরবী ভাষায় শিশুদের জন্য যে গ্রন্থের স্বল্পতা প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হত) লেখার জন্য আলী মিয়া সুযোগ করে উঠতে পারছিলেন না।

১৩৯৫ হিজরী, ১৯৭৬ সনে রমযান মাসে হঠাৎ করে এ ব্যাপারে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন এবং হযরত মূসা আ. -এর পর শুভাগমনকারী নবীদের সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। প্রথমে শিশুদের উপযোগী ভাষা চয়নে সে ঐ স্তরে নামতে সমস্যা হচ্ছিল, যা কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফালের জন্য তিনি অবলম্বন করেছিলেন। মনে হচ্ছিল সেই ভাষা ও বাচনভঙ্গি তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু সামান্য চেষ্টার পর কলমের গতি ফিরে আসে এবং আল্লাহর তাওফীকে চতুর্থ খণ্ড সুসম্পন্ন হয়। এ খণ্ড হযরত শুয়াইব আ. থেকে শুরু হয় এবং ঈসা আ. -এর আলোচনা দিয়ে শেষ হয়। সবশেষে অক্টোবর ১৯৭৭ সালে খাতামুন নাবিয়্যিন সা. -এর জীবনচরিত আলোচনার মধ্য দিয়ে এই ধারাবাহিকতার শুভ সমাপ্তি হয়। এ দু'খণ্ডও 'মুআসসাতুর রেসালাহ' বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৪

পুরস্কার

আলী মিয়া র. তার জীবনে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক ও দেশী পুরস্কারের সম্মাননা লাভ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

শাহ্ ফয়সাল এওয়ার্ড

১৯৮০ সাল। এ বছরই আলী মিয়া তার জীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। মুসলিম বিশ্বে ফয়সাল পুরস্কারের মর্যাদা নোবেল প্রাইজের মতই। নিয়মানুযায়ী পুরস্কার কমিটির পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিত্ব ও সংস্থার নিকট মতামত চাওয়া হয় যে, আপনাদের মতে এ পুরস্কার পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি কে? যার পক্ষে অধিক মতামত পাওয়া যায়, তিনিই এ পুরস্কারের যোগ্য বলে নির্বাচিত হন। এ পুরস্কারের পরিমাণ হল নগদ দুই লাখ রিয়াল, একটি পদক ও সনদপত্র। সনদপত্রে পুরস্কার প্রাপকের অসাধারণ কর্মকাণ্ড ও অবদানের স্বীকৃতি থাকে।

১৯৮০ এর ১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত নির্বাচন কমিটির মিটিং হয়। পুরস্কার প্রাপকদের নামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুরস্কার কমিটির সভাপতি আমীর খালেদ ফয়সাল ইবনে আব্দুল আযীযের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম আসে নদওয়াতুল উলামায়। এতে আলী মিয়া র. কে রিয়াদে এসে উক্ত পুরস্কার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে সময় সৌদী আরব থেকে বেশ কয়েকটি অভিনন্দন বার্তাও আসে। প্রথমেই অভিনন্দনের টেলিগ্রাম আসে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া র. -এর পক্ষ থেকে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, আলী মিয়া নদভী এ পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। তাই টেলিগ্রামের মাধ্যমে হযরতের মনোভাবের প্রতি আলী মিয়াকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

সৌদী আরবের শিক্ষামন্ত্রী শাইখ হাসান আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে আলী মিয়া র. -এর কাছে এক বিশেষ টেলিগ্রাম আসে। তাতে তিনি আলী মিয়াকে অনুরোধ জানান যে, আপনি আমার খাতিরে হলেও পুরস্কার গ্রহণ করুন। এত কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ডক্টর আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। ডক্টর নদভীই তার পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

এ উপলক্ষে কমিটির সভাপতির নামে আলী মিয়া একটি চিঠি পাঠান। যাতে তিনি লিখেছিলেন, উত্তম হত দ্বীনের সেবকদের পুরস্কার তাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে পাওয়া গেলে। কিন্তু আমার অজ্ঞাতেই এ ঘোষণা হয়েছে। এখন আমার পক্ষে মরহুম বাদশাহ ফয়সালের ইসলামের মহান খেদমতের স্বীকৃতি ও সম্মানের খাতিরে এ পুরস্কার গ্রহণ না করে এবং এর জন্য দু'আ না করে উপায় নেই। আমি নিজে উপস্থিত হতে পারছি না। আমার দ্বীনী ভাই ড. আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করছি। তিনি তা গ্রহণ করবেন এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন।

তিনি আরো লিখেছিলেন, এ পুরস্কারের দুটি দিক রয়েছে। একটি হল, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, অর্থাৎ সম্মান ও স্বীকৃতি। তা আমি শরম ও লজ্জার সাথে গ্রহণ করছি। আরেকটি দিক হল, আর্থিক দিক অর্থাৎ এর সাথে যে নগদ অর্থ পাওয়া যাবে, এ ব্যাপারে আমি আপনাদের অনুমতি চাইছি যে, আমি উক্ত অর্থ নিজের বিবেচনা অনুযায়ী ইসলামের স্বার্থে ও দ্বীনী খেদমতে ব্যয় করব। আমার পক্ষ থেকে ড. আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী উক্ত খাতগুলো জানাবেন।

১৯৮০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী রিয়াদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ফয়সাল হলে রাত ৮টায় এ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাদশাহ খালেদ ইবনে আব্দুল আযীযের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে যুবরাজ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আযীয (পরবর্তীকালে বাদশাহ) অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। কয়েকজন যুবরাজ, মন্ত্রীবর্গ ও রিয়াদের গভর্নর এতে অংশগ্রহণ করেন।

ফাহাদ ইবনে আব্দুল আযীয পুরস্কার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের জীবনালেখ্য পাঠ করা হয়। আলী মিয়া নদভীর প্রতিনিধি পদক, সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করেন। এরপর আলী মিয়ার পত্র পাঠ করে শোনান এবং ঘোষণা করেন, পুরস্কারের অর্থের অর্ধেক আফগান শরণার্থীদের জন্য, এক-চতুর্থাংশ জামাআতে তাহফীযুল কুরআনীল কারীমের জন্য, অপর এক-চতুর্থাংশ মক্কার মাদরাসায়ে সৌলতিয়ার জন্য ব্যয় করা হবে।

এ উপলক্ষ্যে হযরতের অজ্ঞাতসারে দারুল মুসান্নিফীনে এবং দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির সম্মানজনক ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রী

১৯৮১ সালের ২৯ অক্টোবর আলী মিয়া র.কে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ডক্টর অব লিটারেচারের সম্মানজনক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৬ অক্টোবর যখন তিনি হজ্জ ও রাবেতার সভা থেকে দেশে ফিরেন তখনই তিনি এ সংবাদ পান। এ ব্যাপারে জম্মু-কাশ্মীরের গভর্নর বি.কে.নেহেরু কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অহিদুদ্দীন মালিক ও প্রফেসর আলী আহমদ সরওয়ারের পক্ষ থেকে হযরতের কাছে পত্র ও টেলিফোন আসে এবং অবিলম্বে সম্মতি জ্ঞাপনের অনুরোধ জানানো হয়। আলী মিয়া বলেন, আমার জন্য এ সংবাদ ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাই তিনি দ্বিধায় পড়ে যান। এরপর ঘনিষ্ঠজনদের সাথে পরামর্শের পর এ শর্তে সম্মত হন যে, অনুষ্ঠান হতে হবে একাডেমিক ও সাহিত্যকেন্দ্রিক। রাজনীতির সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক থাকতে পারবে না। তিনি এ পুরস্কার গ্রহণে এজন্যই রাজী হয়েছিলেন, এ সুযোগে তিনি আধুনিক শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী এবং দেশের কর্মকর্তাদের সামনে জ্ঞানী ও বিদ্বানদের সম্পর্কে নিজের মনোভাব ও পরামর্শ পেশ করতে পারবেন। একজন দাঈ হিসেবে এ সুযোগ হাতছাড়া করা তিনি সমীচীন মনে করেননি।

এ অনুষ্ঠানে আলী মিয়া যে বক্তৃতা পেশ করেন, তার শিরোনাম ছিল, 'ইলম কা মাকাম আওর আহলে ইলম কি যিম্মাদারিয়া'। যেহেতু এটি ছিল একাডেমিক অনুষ্ঠান, তাই তিনি এ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন।

হযরত মাওলানার বক্তৃতার পর যখন বি.কে.নেহেরু বক্তৃতার জন্য দাঁড়ালেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি অনেক সনদ বিতরণ সভায় অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু এমন প্রেরণাদায়ক ভাষণ শুনিনি। এ ভাষণ উর্দুতে ছেপে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর নিকট পাঠানো হলে তিনি এক উত্তরপত্র পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'উক্ত সভায় সুচিন্তিত উপায়ে সমকালীন জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জটিলতার চিত্রায়ন আপনি যেভাবে করেছেন, তা একমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব।'

দুবাই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার

আরবের রাজধানী দুবাই। সেখানে প্রতিবছর রমযানুল মুবারকে বিভিন্ন ইসলামী দেশ থেকে কুরআনে হাফেজদের নির্বাচন করে ২১ রমযান তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ পুরস্কার নিজ হাতে প্রদান করেন দুবাইয়ের যুবরাজ ও আরব আমীরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ দুবাইতে একটি কমিটি গঠন করেন, তাদের দায়িত্ব হল, আরবের সকল ইউনিভার্সিটি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মতামত নেওয়া। ১৯৯৯ সালে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের মত চাওয়া হলে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের ইলমী ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব শাইখ আবুল হাসান আলী নদভীই এ পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তি। লাখনৌতে যখন এ সংবাদ এসে পৌঁছে, তখন হযরতের শরীর ছিল খুব খারাপ। তাছাড়া রমযানের কারণে তিনি সফর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। মাওলানা তাকীউদ্দীন নদভী তখন দুবাইয়ের আল-আইন ইউনিভার্সিটির হাদীসের অধ্যাপক ছিলেন। পুরস্কার কমিটির সভাপতি মাওলানা তাকীউদ্দীন সাহেবকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন যে কোন প্রকারে হযরতকে সফরে রাজী করান। সে মতে তিনি আলী মিয়ার সাথে সরাসরি কথা বলে তাকে রাজী করান। কিন্তু ১৫ রমযানের পর থেকে হযরতের শরীর আরও খারাপ

হয়ে যায়। তখন তিনি রোযাও রাখতে পারছিলেন না। আবারও জানিয়ে দেওয়া হয়, হযরতের পক্ষে সফর করা সম্ভব নয়। কিন্তু পুরস্কার কমিটি চিন্তা করল হযরতের অনুপস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই দুবাই সরকার বিমান পাঠিয়ে হযরতকে নেয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। ২০ রমযান লাখনৌ এয়ারপোর্টে বিমান এসে পৌঁছে। হযরত ও তার সাথীবর্গ সেদিনই দুবাই গিয়ে পৌঁছেন। পরের দিন এশার নামাযের পরে দুবাইয়ের এক বিশেষ হলে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মাওলানার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এরপর হযরত উপস্থিত হন। অনন্তর দুবাইয়ের যুবরাজ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

হযরত খুবই সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্য রাখেন। তিনি এ সম্মাননার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পর ঘোষণা করেন, পুরস্কারের অর্থ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দ করা হবে। আরবদের উদ্দেশ্যে হযরত বলেন, আমার জন্ম ভারতের ছোট্ট এক পল্লীতে। আমার মাতা-পিতার চেষ্টায় আল্লাহ্ পাক আমাকে এমন স্থানে এনেছেন, আজ আপনারা আমাকে সম্মাননা প্রদান করছেন। এ জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি আপনাদের জন্য এটি বার্তা নিয়ে এসেছি। যা আল্লামা ইকবালের ভাষায়, "আরব বিশ্বের প্রাণশক্তি হলেন মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" একথা শুনে অনুষ্ঠানে নীরবতা নেমে আসে। শ্রোতাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। পরের দিন গরীব মসজিদে হযরত জুমআর নামায আদায় করেন। সেখানে তিনি নামাযের আগে বক্তব্য রাখেন। ২২ রমযান হযরত লাখনৌ ফিরে আসেন।

প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের পুরস্কার

আলী মিয়া র. বলেন, বাদশাহ ফয়সাল ও প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের মত অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আমার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। হযরত পাকিস্তান গেলে প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হক তার সাথে সাক্ষাৎ লাভে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। কোন কারণে হযরত ইসলামাবাদে না যেতে পারলে প্রেসিডেন্ট নিজে এসে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী র. রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ সীরাতুন্নবী সা. -এর সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছিলেন আলী মিয়া নদভী র.। প্রেসিডেন্ট যিয়াউল

হক সে ভূমিকা পাঠ করে এতই খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে হযরতকে এক লাখ রূপী পুরস্কারের ঘোষণা দেন। কিন্তু হযরতের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রেসিডেন্টকে পত্র লিখে জানান, মেহেরবানী করে এ অর্থের অর্ধেক এ গ্রন্থের প্রকাশক দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়কে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সাইয়িদ সুলায়মান নদভী র. -এর পরিবারের সদস্যদের প্রদান করুন। এরপর ১৯৮৬ সনে করাচীতে হযরতের সাথে প্রেসিডেন্টের দেখা হলে তিনি বলেন, আপনি যদি এ অর্থ গ্রহণ করতেন তবে আমি খুব খুশি হতাম। হযরত যথারীতি তা অস্বীকার করেন।

১৫

বিবিধ

নদওয়াতুল উলামা কী ও কেন?

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এবং ঈসায়ী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম বিশ্ব বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের বিভীষিকায় চরম নৈরাশ্য আর বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। এ পরিস্থিতি থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল পরিবর্তনশীল আধুনিকতা ও নিত্য নতুন সমস্যা আর নবতর প্রশ্নগুলোর সুষ্ঠু সমাধান দেওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমে দ্বীন তৈরী (যারা হবে মুসলিম মিল্লাতের প্রকৃত দিশারী) এবং সেজন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা কারিকুলামের মাধ্যমে যুবকদের প্রস্তুত করা।

তখন সমাজে অবাঞ্ছিত বিষয়গুলোর দ্রুত প্রসার ঘটছিল। মুসলমানদের জীবনযাত্রা দু'টি সমান্তরাল ধারায় আটকা পড়েছিল। একদিকে ছিল আলেম সমাজ, যারা আরবী মাদরাসাগুলো থেকে প্রাচীন ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতিতে লেখাপড়া

করে বের হয়েছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী, যারা কলেজ-ইউনিভার্সিটির আধুনিকতায় প্রভাবিত হয়ে বের হয়েছিলেন।

এ উভয় শ্রেণী ছিল পরস্পরের নিকট অপরিচিত ও দুর্বোধ্য। পরস্পরের এই দূরত্ব দিন দিল বেড়েই চলছিল। ফলে ক্রমেই এমন একটা আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, এই দু'পক্ষের দূরত্বে এমন একটা বিচ্ছিন্নতার সাগর সৃষ্টি হবে, যার দ্রুত কোন বিহিত না করলে এ তাদের মাঝে কোন সেতুবন্ধন রচনা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

সমস্যা শুধু এ দু' শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মাযহাবী ফেরকা, বিভিন্ন মাসআলাকে অবলম্বন করে দলবদ্ধতা, এ নিয়ে একে অপরকে নিকৃষ্ট ও পাপী মনে করা, পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ ছাড়াও একে অপরকে অত্যন্ত কুদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ সমস্ত বিষয়ের উপর প্রকাশ্যভাবে দিন-তারিখ ধার্য করে ব্যাপক প্রস্তুতির মাধ্যমে 'মুনাযারা' বা তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হত। এসব 'মুজাদালা-মুনাযারা' বা পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ আর তর্ক-বিতর্কের বাজার বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। কখনো কখনো এসব অনুষ্ঠান চরম আক্রমণাত্মক ও আত্মঘাতী রূপ পরিগ্রহ করত।

অবস্থা শুধু নেতিবাচক আর নৈরাশ্যজনকই ছিল না বরং এক দল অন্যদলকে ফাসিক ও কাফির বলে ঘোষণা দেওয়ার মত চরম ধৃষ্টতাও দেখাতে শুরু করে। মাদরাসা শিক্ষায় যে সিলেবাস নির্ধারিত ছিল, তার সামান্য রদবদল করার কোন সুযোগ আছে বলে মনে করা হত না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ চিন্তাধারার কোনরূপ প্রশস্ততা ছিল না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তাধারা ও ইলমী গবেষণার কোন সুযোগ সেখানে ছিল না। দ্বীনী সার্কেলের অচঞ্চল-গতিহীন আর স্থবিরতায় নিমজ্জিত জীবনযাত্রা তখনই কিছুটা প্রাণবন্ত হত, যখন আলেম সমাজ কোন উপলক্ষ্যে রাজনীতির ময়দানে নেমে আসতেন। মুসলিম উম্মাহর জীবনযাত্রায় যাদের অতন্দ্র প্রহরী হওয়ার কথা, সে আলেম সমাজ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ও বিষাক্ত ছোবল থেকে মুসলিম যুব সমাজকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব একান্ত হেলাচ্ছলে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত শ্রেণী ছিল তখন পাশ্চাত্যের তল্পিবাহক। তারা দেশীয় চিন্তা-চেতনা ও কৃষ্টি-কালচার ধ্বংস করার প্রধান হোতাদের দয়া-অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

হিজরী ১৩১০, ঈসায়ী ১৮৯২ সালের এই বিভীষিকাময় ও নিদারুণ ক্রান্তিকালে সময়ের এক আলোকবর্তিকা, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী আলেম সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী র. -এর একান্ত প্রচেষ্টায় মাদরাসা ফয়যে আম কানপুর -এর বাৎসরিক সম্মেলনে দস্তারবন্দীর (পাগড়ী প্রদান) সময় 'আঞ্জুমানে নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

সংগঠনটির নাম 'নদওয়াতুল উলামা' রাখার কারণ ছিল যে, এ সংগঠন মূলতঃ আলেম সমাজেরই চিন্তা-চেতনা এবং তাদের ডাকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তারাই এর প্রাণ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। এ সংগঠন যে ক'টি প্রতিজ্ঞা সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছিল, তা ছিল নিম্নরূপ-

১. মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য। ২. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ইহ ও পারলৌকিক সফলতার জন্য বিভিন্ন রকম সাংগঠনিক ইসলাহী ও শিক্ষাগত পদক্ষেপ গ্রহণ। ৩. উচ্চতর আদর্শ ও মযবুত কর্মসূচী গ্রহণ। ৪. কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলোৎপাটন। ৫. মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন সময় সমাধানের জন্য বিভিন্ন মাসলাকের (পথ ও মতের) বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসের (আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআত) আলেমদের একটি মিলিত প্লাটফরম তৈরী। ৬. ইসলামী শরী'আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে দ্বীনী শিক্ষার সিলেবাসে এমন পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনা, যা বর্তমান চাহিদা পূরণে কার্যকরীভাবে সক্ষম হয়। ৭. উলামায়ে কেরামের দ্বীনী অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-বিদ্যার পরিধির ব্যাপক সম্প্রসারণ। ৮. এমন আলেম তৈরী করা, যারা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। তারা মুসলমানদের ধর্মীয় ও অন্যান্য চিন্তা-চেতনা ও আক্বীদা-বিশ্বাসের এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, যেখানে বেশ কিছুকাল ধরে শূন্যতা বিরাজ করছিল।

এ সমস্ত ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট একটি এলাকার নাগরিক ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের। অনেক দূর থেকেই তারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু জাতির ঘোর দূরবস্থা আর অধঃপতন তাদেরকে মারাত্মকভাবে মর্মাহত ও ব্যথিত করে তুলেছিল। তারা সবাই এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আন্তরিকভাবে আশা করতেন, ব্যাকুল হয়ে খুঁজতেন একটি মযবুত অবলম্বন। এটা সে সময়ের কথা,

যখন একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন ইসলামী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলো বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। লাইব্রেরী আর গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো পোকামাকড়ে দখল করে নিয়েছিল। তার একমাত্র কারণ, মুসলমানরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ আর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এর অনিবার্য পরিণামে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, চিন্তা-চেতনা মন-মস্তিষ্ককে যেভাবে ধোলাই করে ফেলেছিল, সে তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষা-সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার রক্ষায় তাদের শিক্ষা পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকটা দুর্বল প্রতীয়মান হয়েছিল।

১৩১১ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৪ ঈসায়ীতে যে সংস্কার আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল, 'নদওয়াতুল উলামা' সংগঠনের মাধ্যমে যে সংস্কার আন্দোলনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা সফলতার সাথেই অগ্রসর হচ্ছিল নির্দিষ্ট মঞ্জিলের দিকে। এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এবং ব্যাপক প্রস্তুতির মাধ্যমে আড়ম্বরতার সাথে হিন্দুস্তানের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এর আলোচনা গোটা হিন্দুস্তানে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু এ পর্যন্তই শেষ নয় বরং এমন একটা পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়, যাতে তারা ১৩১৬ হিজরীতে (১৮৯৮ ঈসায়ী) লাখনৌতে নিজেদের চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারে একটি সময়োপযোগী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠা করেন। যেখান থেকে প্রতি বছর অসংখ্য নামী-দামী আলেম, গবেষক, চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, কলামিস্ট, ভাষাবিদ ও দ্বীনের দাঈ হয়ে বের হয়েছেন। যারা নদওয়ার নাম বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন এবং নিজেদের জন্য বিশ্ব দরবারে এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসন দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

নদওয়াতুল উলামা ও আলী মিয়া

১ আগস্ট ১৯৩৪ সালে আলী মিয়া র. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন। পূর্ণ পয়ষট্টি বছর বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি ও নদওয়া পরস্পর জড়িয়ে থাকেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি একজন শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দেন। পালন করেন সহকারী শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব। এরপর শিক্ষাসচিবের পদে আসীন হন।

এরপর পরিচালক হিসেবে নদওয়াতুল উলামার সকল বিভাগের জিম্মাদারী বহন করেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। শুরুতে তিনি নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, নদভী চেতনাসম্পন্ন আলেম, মুফাসসির ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হতেন। কিন্তু দুনিয়া এমন যুগও প্রত্যক্ষ করেছে, যখন নদওয়া তার নামেই পরিচিত হতে থাকে এবং মুসলিম বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে সবাইকে ছাড়িয়ে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেন। তার প্রচেষ্টায় যে নূরানী পরিবেশ ও দ্বীনী প্রাঙ্গন গড়ে উঠেছিল, তার রোশনীতে আজো নদওয়ার প্রতিটি অঙ্গন দেদীপ্যমান ও সেই অনুগ্রহবারিতে এখানকার প্রতিটি পত্র-পল্লব, সবুজ-শ্যামল ও সজীবতায় ভরপুর।

১৯৪৮ সালে যখন আলী মিয়া সহকারী শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন, তখন পুরো হিন্দুস্তানে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত সাইয়িদ সুলায়মান নদভী র. -এর মৃত্যুর পর ১৯৫৪ সালে তিনি শিক্ষাসচিব মনোনীত হন। লেখালেখির ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকে। দারুল উলূমের উস্তাদদের দিকনির্দেশনা দান ও শ্রেণীকক্ষে গিয়ে তাদের ক্লাসের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী সিলেবাসে পরিবর্তন ও সংযোজনের কাজও সমানতালে চলতে থাকে।

হেজাযের দ্বিতীয় সফর থেকে ফিরে তার প্রিয়ভাজন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মুঈনুল্লাহ সাহেব কনস্ট্রাকশনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন এবং সফরে ও নদওয়ায় অবস্থানকালে তার সার্বক্ষণিক সাহচর্য গ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা মুঈনুল্লাহ সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা চতুর্মুখী প্রতিভা দান করেছিলেন। মাওলানা আলী মিয়া র. নদওয়াতুল উলামার পরিচালক হওয়ার পর নিয়মতান্ত্রিকভাবে না হলেও কার্যতঃ তিনিই নদওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। বিল্ডিং নির্মাণ, মসজিদে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষকদের বাসভবন নির্মাণ, মযবুত বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরী- এসব মাওলানা মুঈনুল্লাহ সাহেবের অবদান। হযরত মাওলানা আলী মিয়া পরিচালক হওয়ার পর মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক যোগানের দায়িত্ব মাওলানা মুঈনুল্লাহ সাহেব গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা আঞ্জাম দেন। হযরত মাওলানার জনপ্রিয়তাকে ওসীলা করে নদওয়ার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে তার ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ডাক্তার সাইয়িদ আবদুল আলী যখন

রোগাক্রান্ত হন, মূলতঃ তখন থেকেই হযরত মাওলানা আলী মিয়া পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন এবং বড় ভাইয়ের পরামর্শে তিনি মুঈনুল্লাহ সাহেবকে তার দক্ষিণ হস্ত ও নির্ভরতার প্রতীক বলে মনে করতেন। ক্রমেই ছাত্রদের সংখ্যা বাড়ছিল। একে একে রাহমানিয়া হল, সুলায়মানিয়া হল এবং শিবলী হলের পার্শ্বের তিনতলা ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। এরপর অন্য সব বিল্ডিং নির্মিত হয়। দেখতে দেখতেই ডালপালা ছড়িয়ে নদওয়ার চেহারায় নতুন জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

হযরত মাওলানা আলী মিয়া পরিচালক থাকাকালে পুরো হিন্দুস্তানে নদওয়া শুধু একটি মাদরাসা হিসেবেই পরিচিত ছিল না বরং এটি পরিচিত ছিল চেতনা ও চিন্তাধারার এক বিপ্লবী ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে। অবশ্য ছাত্রসংখ্যা খুব কম ছিল। কারণ সামর্থ্য নেই এমন ছাত্রদের বৃত্তি ও ফ্রী থাকার ব্যবস্থা ছিল না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে চাঁদা আদায় করার জন্য নির্ধারিত কোন লোকও ছিল না। হায়দারাবাদ ও অন্যান্য কিছু এলাকার বিত্তবানদের সাহায্যই মাদরাসায় আয় ছিল। আর সকলেরই জানা আছে, মাদরাসায় সামর্থ্যবান ছাত্রদের সংখ্যা সব সময়ই কম। সামর্থ্য নেই এমন ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। বিত্তবান, উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা সাধারণতঃ স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই মাদরাসায় পড়তে আসে। অর্থ ব্যয় করে তাদের পড়াশোনার সুবিধা থাকে না। এদের জন্য নদওয়ায় তেমন একটা সুযোগ ছিল না। ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতা-বিভিন্ন ধরনের কুধারণার সৃষ্টি করত। কোন কোন মহল প্রচার করছিল, জাতি নদওয়ার সিলেবাস গ্রহণ করেনি বরং ইসলামী ইতিহাসের পতন যুগে প্রণীত পুরাতন দরসে নেযামীর সিলেবাসই জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত। অথচ বাস্তবতা হল, দারুল উলূম নদওয়া সূচনালগ্ন থেকেই বিশেষ ধারায় চলছিল এবং জনসাধারণ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য এর বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া এমন ব্যক্তিত্বেরও অভাব ছিল, যারা দ্বীনদার ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত। আর যারা ছিলেন, তাদের ব্যাপারে পূর্ণ নির্ভরতার সাথে বলা যায়, তারা স্বীয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন।

হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান র., মাওলানা শিবলী, মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম নদভী, মাওলানা আব্দুস সালাম কাদওয়ারী র. প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাদের সাথে

সর্বসাধারণের সম্পর্ক ছিল না। হযরত মাওলানা আলী মিয়া র. প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিবাদী উভয় শ্রেণীর আস্থা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের নদভী চিন্তাধারা ও চেতনার নমুনা। নদওয়ার প্রতিষ্ঠাতাগণ যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব গড়তে চেয়েছিলেন, হযরত মাওলানা ছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর মত নদভী চিন্তাধারা থেকে চুল পরিমাণও না হটে নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শ পথ-নির্দেশক হয়েছিলেন। মাওলানা মুঈনুল্লাহ সাহেব র. যখন হযরত মাওলানার জনপ্রিয়তা, ইলমী ও রূহানিয়াতকে কাজে লাগিয়ে লোকদেরকে দ্বীনী শিক্ষার জন্য নদওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেন, তখন দলে দলে ছাত্র নদওয়ায় আসতে থাকে। এতে নদওয়ার উদারসুলভ চিন্তাধারা ব্যাপকতা লাভ করে এবং সর্বমহল এর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেয়।

মোটকথা, হযরত আলী মিয়া পরিচালক থাকাকালে 'নদওয়া' স্বীয় চিন্তাধারা ও শিক্ষার মানে অধিষ্ঠিত থেকেই মুসলিম বিশ্বে পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। স্বদেশের হৃদয়বান ও ন্যায়নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ এর স্বীকৃতি প্রদান করে। কিছু লোক যারা নদওয়ার মূল চিন্তাধারার সাথে পরিচিত নয়, যাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত, তারা নদওয়ার নামে কিছু অপপ্রচারের চেষ্টা করে। যেমন বলা হত, নদওয়াকে দেওবন্দের পদ্ধতিতে সাজানো হচ্ছে। অথচ একদিনের জন্যও নদওয়া অন্য কোন মাদরাসার সিলেবাস অথবা শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করেনি এবং অনদভী চিন্তাধারার অনুসরণ করেনি। অতীত বছরগুলোতে নদওয়াকে একটি 'এ্যারাবিক কলেজ' নামে প্রচারের প্রচেষ্টা চালানো শুরু হয়। যখন এ ধারণার অপনোদন করা হয়, তখন লোকেরা কঠোরভাবে এর বিরোধিতা শুরু করে।

হযরত আলী মিয়াকে আল্লাহ তা'আলা সার্বজনীনতা ও মুসলিম বিশ্বে বিপুল জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই নদভী চিন্ত াধারার সাথে মানুষকে পরিচিত করিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বুযুর্গানে দ্বীন থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিকতার ফয়েযে নদওয়াকে সিক্ত করেছেন। তার দু'আর প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি আধ্যাত্মিকতা, খোদাভীতি ও পরকালভীতিতে প্রাণ জাগ্রত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাতে কিছুটা অতৃপ্তি ও পিপাসা ছিল সত্য। কিন্তু চেতনার বিনির্মাণে, চিন্তাধারা ও ইলমী স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, নদওয়ার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং সিলেবাসের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও উন্নয়নে এক বিন্দুও অতৃপ্তি, অসম্পূর্ণতা

ও অসামঞ্জস্যতা থাকেনি বরং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোন কোন উপায়ে নদওয়ার সিলেবাসের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছে। মোটকথা, প্রশ্ন উত্থাপনকারী আগের হোক বা পরের, তাদের কথা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল। আসল সত্য তা-ই, যা হযরত মাওলানা নদওয়ার পরিচালক থাকাকালে সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে পরিচিত করিয়েছেন, প্রচার করেছেন, যার উর্ধ্বগতি ও অগ্রসরতা কামনা করেছেন। দ্বীনী খেদমতের যে ধারাবাহিকতা তিনি শুরু করেছিলেন, সদকায়ে জারিয়া হিসেবে তার সওয়াব ও পুরস্কার ইনশাআল্লাহ তিনি পেতে থাকবেন। হযরত মাওলানা তার এ কথাগুলি নিজের আত্মজীবনী 'কারওয়ানে জিন্দেগী' এর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন। পাঠকের সুবিধার্থে তা হুবহু তুলে ধরা হল।

"দ্বীন ও আকায়েদের ক্ষেত্রে খালেস দ্বীনের উপরই নদওয়াতুল উলামার মত ও পথের ভিত্তি, সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা থেকে পবিত্র, ব্যাখ্যা ও বিকৃতি থেকে মুক্ত, সংমিশ্রণ ও ভণ্ডামী থেকে দূরে এবং সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ও নিরাপদ।

দ্বীনের অনুধাবন, তার ব্যাখ্যা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে নদওয়ার নীতি হল, ইসলামের প্রাথমিক, নির্মল ও পরিচ্ছন্ন উৎসধারাকে অবলম্বন এবং মূলের দিকে ফেরার মানসিকতা।

আমল ও আখলাকের ক্ষেত্রে এর নীতি হল, দ্বীনের মগজ ও মৌল জিনিসকে গ্রহণ করা, তার উপর দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকা। আহকামে শরইয়্যার উপর আমল, হাকীকাতে দ্বীন ও রূহে দ্বীনের সাথে নৈকট্য এবং তাকওয়া ও আত্মসংশোধনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে তার ভিত্তি এ সিদ্ধান্তের উপর যে, ইসলামের উত্থান ও বিকাশের যুগ সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান যুগ। নবুওয়াতের ছায়াতলে ও রেসালাতের আদর্শে যারা দীক্ষা লাভ করেছেন এবং কুরআন ও ঈমানের শিক্ষালয় থেকে তৈরী হয়ে বের হয়েছেন, তারাই সবচেয়ে বেশি আদর্শবান ও অনুসরণযোগ্য। আমাদের সৌভাগ্য ও নাজাত, সফলতা ও কামিয়াবী এতেই সীমাবদ্ধ। অতএব বেশি বেশি তাদের জ্ঞান ও ইলম আমরা আহরণ করব এবং তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করব।

বিদ্যার্জন ও শিক্ষা দর্শনের ক্ষেত্রে নদওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হল, জ্ঞান মূলতঃ সবই এক ধরনের। পুরাতন ও নতুন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শব্দ দ্বারা জ্ঞানকে বিভাজন করা যায় না। যদি কোন বিভাজন সম্ভব হয়, তবে তা হবে শুদ্ধ ও

অশুদ্ধ, উপকারী ও অপকারী হিসেবে, আহরণের মাধ্যম ও উদ্দেশ্যের বিচারে। জ্ঞানদান ও জ্ঞান আহরণে, গ্রহণ ও বর্জনে নদওয়ার নীতি সেই বিজ্ঞোচিত নববী শিক্ষার উপর ভিত্তিশীল, যা মহানবী সা. সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই সে তা পায়, সেই তার সবচেয়ে বেশি হকদার" এবং প্রজ্ঞাময় সেই পুরাতন উক্তির উপর যে, خذ ماصفا ودع ما كدر "যা কিছু পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন তা গ্রহণ কর আর যা কিছু অপবিত্র ও অস্বচ্ছ, তা পরিহার কর।"

ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় এবং আজকের প্রগতিবাদী ধর্মহীন শক্তির প্রতিরোধে নদওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর এ বাণীর উপর যে,

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة

"তাদের মোকাবেলায় যথাসম্ভব সবটুকু শক্তি তোমরা অর্জন কর।"

দাওয়াত ইলাল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা, বিবেক ও বুদ্ধিতে তার হক্কানিয়্যাতের ও সত্যতার উপর নিশ্চিত করার জন্য নদওয়ার পদক্ষেপ হল, সেই বিজ্ঞোচিত উপদেশের উপর যে,

كلموا الناس على قدر عقولهم اتريدون ان يكذب الله ورسوله

"মানুষের সাথে কথা বল তাদের বিবেকের পরিধি অনুসারে। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক।"

আকাইদ ও মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে নদওয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পথের অনুসরণ এবং সকলের মতামত ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের আওতাধীন থাকাকে জরুরী মনে করে। ফিকহী ও শাখা মাসায়েলের ক্ষেত্রে নদওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হল, যতটুকু সম্ভব মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েল ও ঐ সকল পথ পরিহার করা, যেগুলোর দ্বারা পারস্পরিক দলাদলি এবং উম্মতের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। সলফে সালেহীনের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং তাদের কাজের সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে হবে। ইসলামের স্বার্থকে সামগ্রিক স্বার্থের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত কথা হল, নদওয়া হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী র. -এর চিন্তাধারার সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ হিসেবে নদওয়াতুল উলামা সাধারণ একটি প্রতিষ্ঠানই নয় বরং পরিপূর্ণ ও বহুমুখী এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রতিষ্ঠান, চিন্তাধারার একটি নতুন মোহনা।

নদওয়াতুল উলামার দ্বীনী মাসলাক, জ্ঞানার্জন ও ইতিহাস পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা এবং এ আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝাতে

এবং নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতাগণের গভীর দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে হযরত মাওলানা আলী মিয়া বলেন, "মুসলমানরা হিন্দুস্তানে এসে যে ইসলামী-হিন্দুস্তানী কৃষ্টি ও সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, সে কৃষ্টি ও সভ্যতার মাঝে আড়ম্বরতাও আছে, বিনয়-নম্রতাও আছে, সাহসিকতাও আছে, নৈতিকতাও আছে, গভীরতাও আছে, কাঠিন্যও আছে, সিক্ততাও আছে আবার আছে সহিষ্ণুতাও। তার আঁচলে উলূমে শরী'আতও আছে, হিকমতও আছে, সাহিত্য ও কবিতাও আছে, দারিদ্র ও দরবেশীও আছে, সূক্ষ্মদর্শিতাও আছে আবার সৌখিনতাও আছে। তার প্রিয় ময়দান কেল্লা আবার কুতুবখানাও। এখানে মাদরাসাও আছে, খানকাহ্ও আছে। আবার গবেষণা ও রচনার পরিসরও আছে। তাতে গাম্ভীর্য আছে, আবার কৌতুকও আছে। তার মতামত প্রকাশের ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার মাধ্যম আরবী, উর্দু, ফার্সী, হিন্দী প্রতিটি ভাষাই।

বাইতুল্লাহ্র পথে আলী মিয়া

হযরত আলী মিয়া ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই, ১৩৬৬ হিজরীর ২৯ শাবান আরব বিশ্বের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক মহলে দাওয়াতের কাজটিকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে জেদ্দা পৌঁছেন। এ সফরে আলী মিয়া তার মাতা, স্ত্রী, বোন ও বড় ভাগিনা মুহাম্মাদ ছানীকে সাথে নিয়ে যান। রমযান শুরু হয়ে যায়। হযরত মাওলানা প্রথমে তিন মাস মদীনায় অবস্থান করেন এবং মদীনায় উচ্চ শিক্ষিত সমাজে দাওয়াতের কাজের পরিচয় তুলে ধরেন। ২০ জিলকদ তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। হজ্জের পর মক্কা শরীফেও তিনমাস অবস্থান করে দাওয়াতের কাজকে সুধী সমাজের সামনে তুলে ধরেন। হযরত মাওলানা সেখানকার আরবী সাহিত্যের বড় বড় আলেম এবং জ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

১৯৫০ সালে হযরত আলী মিয়া স্বীয় মোরশেদ হযরত মাওলানা রায়পুরীর সাথে হজ্জ করেন। এটা ছিল মাওলানা আলী মিয়ার দ্বিতীয় হজ্জ। এ হজ্জের সফর সম্পর্কে হযরত রায়পুরী বলতেন, "এ সফর আমি তোমার জন্যই করছি।" ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে তিনি বোম্বাই হতে ইসলামী জাহাজে রওয়ানা হন। এ হজ্জের পর হযরতের জীবনের সবচেয়ে মোবারক দিনটি ছিল, যেদিন কাবা শরীফের চাবি হেফাযতকারী শায়বী সাহেবের

দাওয়াতে তিনি ও তার সাথী-সঙ্গীরা পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশের সুযোগ পান। এ সুযোগ তার পীর মুর্শিদ হযরত রায়পুরীও পেয়েছিলেন। হযরত আলী মিয়া তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, রাবেতা আলমে ইসলামীর সদস্য হওয়ার কারণে এ সুযোগ পরবর্তী সময়ে আরও দু'বার হলেও তাতে তিনি সফলকাম হননি। শুধু তার পীর মুর্শিদের দু'আ ও আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে এ হজ্জের সফরেই এই সৌভাগ্য লাভ করেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সময় ধরে হযরত রায়পুরীর সোহবত তিনি শুধু এ সফরেই লাভ করেছিলেন।

নামাযের সময় হযরত রায়পুরী অবস্থান করতেন হেরেম শরীফের একটি তাবুতে। দুপুরে তিনি সেখানেই খেতেন। হযরত আলী মিয়ার তাবলীগী ইজতিমা এবং উলামা ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনার কারণে তাবুতে ফিরতে প্রায়ই বেশ দেরি হয়ে যেত। তিনি ফিরে এসে দেখতেন, তার পীর ও মুর্শিদ বসে আছেন আর সামনে রুমালে রুটি পড়ে আছে। তিনি আলী মিয়াকে দেখেই বলে উঠতেন, "আলী মিয়া, তোমার খানারও হুঁশ নেই। এই দেখ, আমি তোমার জন্য চাপাতি-রুটি নিয়ে বসে আছি। কেননা সাধারণ রুটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।" মদীনা শরীফে যাওয়ার সময় হলে তিনি হযরত আলী মিয়াকে বলেছিলেন, "এখন থেকে তুমি আমার সাথে থাকবে। শাইখের মেহমানদারী শেষ।" (ঐ সময় আলী মিয়া শাইখের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করছিলেন।)

মদীনাতে তিনি নিজ শাইখের সাথেই ছিলেন। ১৯৫০ সালে ২ নভেম্বর হযরত রায়পুরী নিজের সাথী-সঙ্গীসহ জাহাজে আরোহন করেন। হযরত রায়পুরীর একজন খাদেম বলেন, লঞ্চ থেকে যত সময় আলী মিয়াকে দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত রায়পুরী তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হযরত রায়পুরী তার এ মুরীদকে কেমন মহব্বত ও শফকতের নজরে দেখতেন তা উক্ত ঘটনা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়। হযরত আলী মিয়া সৌদী আরব ও অন্যান্য দেশে সফরের কর্মসূচী থাকার কারণে হযরতের সাথে ফিরে আসতে পারেননি।

কাবা শরীফের চাবি আলী মিয়ার হাতে

মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যখন কাউকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা হয় তখন তা এত বিপুল ও বিশাল হয় যে, স্বয়ং ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডলও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়; ফেরেশতারাও উক্ত মাটির

মানুষ আদম সন্তানকে ঈর্ষার চোখে দেখতে থাকে। উক্ত ঘটনার মুহূর্তগুলো স্বর্ণাক্ষরে অংকিত থাকে ইতিহাসের পাতায়।

এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল ৮ শাবান ১৪১৭ হিজরী মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে বুধবার ভোরে বাইতুল্লাহ্ শরীফের দরজার নিকট। হযরত আলী মিয়া সৌদী আরব সরকারের দাওয়াতে রাবেতা আলমে ইসলামীর মক্কা শাখা এবং রাবেতা মসজিদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিটির মিটিংয়ে যোগদানের জন্য ১ শাবান ১৪১৭ হিজরী মোতাবেক ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সনে মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। সেখানে রাবেতার মিটিংয়ে যোগদানের পর ৮ শাবান বাইতুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করার জন্য উক্ত কমিটির সদস্যদের অনুমতি দেওয়া হয়। হযরত আলী মিয়া এ সৌভাগ্য ইতোপূর্বেও বেশ কয়েকবার লাভ করেছিলেন। তাই এবার খুব একটা আগ্রহ তার ছিল না। কেননা তখন তার শারীরিক দুর্বলতা বেড়ে গিয়েছিল, তাছাড়া ভীড়ও হবে অনেক আবার তার ওষুধ খেতে হয় ভোর সাড়ে ছয়টায়। কাজেই তার পক্ষে ভীড়ের মধ্যে সেখানে যাওয়া কষ্টকর। তারপরও তিনি চিন্তা করলেন, এ সুযোগ বারবার আসে না। বয়সের ভারে তার শরীরের যে অবস্থা তাতে আর ক'বারই বা মক্কা শরীফে আসা হবে তা বলা যায় না। সুতরাং তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সঙ্গে ছিলেন উছমান সাহেব, হাজী আব্দুর রাজ্জাক ও মাওলানা বেলাল হাসানী। প্রথমে তিনি অত্যন্ত ভীড়ের কারণে কাবা শরীফ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর কাবা শরীফের দরজার সাথে লাগানো সিড়িতে গিয়ে বসলেন। কেননা কাবার চাবিরক্ষক শায়বী সাহেব তখনও আসেননি। শায়বী সাহেব হলেন হযরত উছমান ইবনে তালহা রা. -এর বংশধর। হযরত উছমান ইবনে তালহা শায়বী রা.কে স্বয়ং মহানবী সা. কাবা শরীফের চাবি অর্পণ করেছিলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার বংশধররা উক্ত চাবি সংরক্ষণ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেমতে আজ পর্যন্ত এ পবিত্র ও সম্মানিত আমানত পর্যায়ক্রমে তারই বংশধররা সংরক্ষণ করে আসছেন। মহা পরাক্রমশালী সম্রাট হোক কিংবা সাধারণ যিয়ারতকারী হোক কাবা শরীফে প্রবেশ করতে হলে কাবার তালা ও দরজা খোলার সৌভাগ্য ও সম্মান শুধু তাদেরই হয়। কিছুক্ষণ পর শায়বী সাহেব আগমন করলেন এবং সালাম ও দু'আর পর হযরত মাওলানাকে পিছন দিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত সম্মানের সাথে উপরে নিয়ে গেলেন, তখনও তিনি

অনুমান করতে পারেননি যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ সৌভাগ্য ও মহাসম্মানের জন্য নির্বাচিত করেছেন। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে এবং কাবা শরীফের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শায়বী সাহেব হঠাৎ কাবা শরীফের পবিত্র চাবি হযরত মাওলানার সামনে ধরে বললেন,

انت شيخ العالم وشيخ الحرم أيضا. إفتح الباب بيدك لنتبرك

একথা বলেই তিনি চাবিটি কাবার চৌকাঠের উপর রেখে দিলেন এবং হযরত মাওলানাকে দরজা খোলার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

সেমতে তিনি মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে (যারা রাবেতার মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য আগমন করেছিলেন) নিজ হাতে কাবা শরীফের দরজা খুললেন এবং সর্বপ্রথম তিনিই প্রবেশ করলেন। এরপর সৌদী আরবের সাবেক শাসক সৌদ ইবনে আব্দুল আযীযের পৌত্র মাশআল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'উদ (যিনি অন্যতম যিয়ারতকারী ছিলেন) হযরত মাওলানাকে দু'আ করতে অনুরোধ করেন। হযরত মাওলানা দু'রাকাআত নামায আদায়ের পর সবাইকে নিয়ে দু'আ করেন। কাবা শরীফ থেকে বের হওয়ার পর রাবেতার বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম তাকে প্রাণখোলা মোবারকবাদ দিতে থাকেন। শাইখ মুহাম্মদ আব্দুহ ইয়ামানী বলেন-

انت شيخ الكعبة يا ابا الحسن مبروك.

আরব-অনারবের উলামায়ে কেরামও তাকে মোবারকবাদ জানাতে থাকেন। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় একে ভারতের সম্মান আখ্যা দিয়ে প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে হযরত আলী মিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে নদওয়ায় পত্র আসতে থাকে। অনেকে কবিতাও রচনা করেন। উল্লেখ্য, হযরত আলী মিয়াকে কাবা শরীফের চাবি প্রদানের জন্য প্রিন্স মাশআলই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কেননা তিনি তার রচনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পড়তেন। ফলে হযরতের প্রতি তার অগাধ ও অকৃত্রিম ভক্তি ছিল।

বাংলাদেশে আলী মিয়া

হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী র. প্রথমবার ১৯৮৪ সালে ৯ মার্চ বাংলাদেশ সফরে আসেন। হযরতের কয়েকখানা কিতাবের অনুবাদ ইতোমধ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের হয়েছিল। ফলে এদেশের আলেম সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। হযরত মাওলানা সুলতান যওক, মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী,

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন ডিজি আবুল ফায়েদ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান প্রমুখের দাওয়াতে তিনি এ সফর করেন। ১৯ মার্চ পর্যন্ত দশদিনব্যাপী এ সফরে তিনি ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি এলাকা সফর করেন। ঢাকার সফরে তিনি সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন এবং হযরত শাইখ আবু তাওয়ামার মাজারে ফাতিহা পাঠ করেন। ১৬ মার্চ তিনি বাইতুল মোকাররমে জুমআর খুতবা দেন এবং নামাযের পূর্বে বয়ান করেন।

এ সফরে তিনি বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী সংগঠন এবং বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হোটেল পূর্বাণীতে দেওয়া অভ্যর্থনা জলসায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতায় তার মর্মবাণী ছিল নিম্নরূপ-

১. আপনাদেরকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণভার হাতে নিতে হবে। ২. উলামা ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে সজাগ ও হুঁশিয়ার থাকতে হবে। ৩. আপনাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, নিজেদের কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে জনগণের সামনে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কথা তিনি তুলে ধরেন। রবি ঠাকুরের পরিবর্তে কবি নজরুলকে সারা দুনিয়ায় পরিচিত করার দায়িত্ব এ দেশের মুসলমানদের উপর রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন এবং বলেন, আপনাদেরকেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এ জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাবে। এ ভাষণসমূহ তোহফায়ে মাশরিক নামক গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে, যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রাচ্যের উপহার নামে অনূদিত হয়েছে।

ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি বিশিষ্ট দানবীর আলহাজ্ব বশীরুদ্দীন সাহেবের বাসায় অবস্থান করেন। ২০ মার্চ তিনি ঢাকা থেকে কলকাতা রওয়ানা হন।

১৯৯৪ সালে তিনি তার বাংলাদেশী গুণগ্রাহী বিশেষ করে রাবেতায়ে আদবে ইসলামীর (আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য) বাংলাদেশ ব্যুরোর চেয়ারম্যান মাওলানা সুলতান যওক সাহেবের দাওয়াতে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফরে আসেন।

ধন্য যারা লুটিয়ে চরণে তার

হযরত আলী মিয়ার নিকট সারা বিশ্বের অসংখ্য আলেম, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বাই'আত হয়েছিলেন এবং বাতেনী ইসলাহের জন্য তার

সবক ও পরামর্শ মেনে চলতেন। তাদের মধ্যে অনেককেই তিনি ইজাযত ও খেলাফত দান করেছিলেন। তার আধ্যাত্মিক তরবিয়তের অনেক কিছুই গোপন থাকত। তার খলীফাগণের অনেকেও নিজের অবস্থা গোপন রাখতেন এবং হযরতের নিকট থেকে ইজাযত প্রাপ্তির কথা প্রকাশ পেতে দিতেন না। হযরতের স্নেহাস্পদ মাওলানা মাহমুদ হাসান নদভীর মাধ্যমে অবগত হওয়া কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফাগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী, বর্তমান নাযেম, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ, ভারত।
২. হযরত মাওলানা আবদুল করীম পারেখ, নাগপুর, ভারত।
৩. শাইখ আবদুল ওয়াহহাব যায়েদ হালাবী নদভী, কোরিয়া। তার হাতে প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান হয়েছে।
৪. শাইখ আবদুল করীম সুলায়মান, মিশর। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।
৫. মাওলানা আব্দুর রশীদ নুমানী র., পাকিস্তান। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস।
৬. হযরত মাওলানা আলী আদম নদভী, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৭. হযরত মাওলানা সাঈদ বান্নু, দক্ষিণ আফ্রিকা।
৮. ডক্টর ইবাদুর রহমান, প্রফেসর উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা।
৯. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওলী নূর, জেদ্দা।
১০. ডক্টর সাইয়িদ ফখরুদ্দীন আওরঙ্গাবাদ, ভারত।
১১. হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী, সাবেক পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
১২. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান, মুহতামিম, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
১৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভী, পরিচালক, জামেয়া দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
১৪. হযরত মাওলানা জুলফিকার নদভী, শিক্ষক, দারুল মাআরিফ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
১৫. হযরত মাওলানা সাইয়িদ যহূরুল হাসান নদভী, বাদায়ুন, ভারত।
১৬. হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দীকী ফুলভী, মুযাফফর নগর, ভারত।
১৭. হযরত মাওলানা ওমর লাদাখী, কাশ্মীর।
১৮. হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ মুগীছী, মীরাঠ, ভারত।
১৯. হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন, বিহার, ভারত।

২০. হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল আযীয রায়পুরী র., ভারত।
২১. হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান লাহোরী র., পাকিস্তান।
২২. হযরত মাওলানা ইউনুস পালনপুরী, ভারত।
২৩. হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব নদভী, ভারত।
২৪. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ হাসানী নদভী, ভারত।

একটি চিঠি

বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক নদওয়ার উস্তাদ মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর নিকট লিখিত একটি চিঠি

ভাই মাসউদ আলম নদভী!

যে জমিনে আপনি পদার্পণ করেছেন, সেখানকার বিরান ভূমিতে দ্বীন-ইসলামের বীজ বপনে কোন একটি মুহূর্তও হাতছাড়া করবেন না। জান-প্রাণ দিয়ে মেহনত করে যান। রাত-দিন একাকার করে ফেলুন। দেহ-মনে আগুন জ্বালিয়ে দিন। নয়নযুগল ও কলিজার তপ্ত খুন ঢালতে থাকুন। দজলা এবং ফুরাতের প্রশস্ত বুকও যেন সংকীর্ণতায় কাতর হয়ে মাতম করতে থাকে। একেক লোককে জড়িয়ে ধরে বলুন, হে আরব মরু সাহারার বিভ্রান্ত পথিক! সারা আলমে ইসলামের ইজ্জত-আব্রুর কেন্দ্রভূমি! ইবরাহীম আ. ও সাইয়েদুল মুরসালীন সা. এর নয়নমণি! তুমি আজ কোথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ? তুমি কি মনে কর, হযরত উমর ফারুক রা. এর শেষ রাত্রির দু'আ ও ক্রন্দন, মুসান্না ইবনে হারেসা রা. -এর শাহাদাতের তপ্ত খুন, আবু উবায়দা সাকাফী রা. এর হাড়ভাঙ্গা কষ্ট, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এর উড্ডীন বিজয় কেতন, আলী রা. এর রক্তাশ্রু বর্ষণ, শুহাদায়ে ইসলামের তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ, খান্দানে রেসালাতের আত্মত্যাগ, আবু হানীফা র. এর নিরলস পরিশ্রম, আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর কারাভোগ, ইবনুল জাওযী র. এর সুন্নত প্রীতি, আব্দুল কাদের জিলানী র. এর দরূদ ও জিকির; মোটকথা, সাহাবা, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের এত আত্মত্যাগ ও কুরবানীর পরও তুমি কিভাবে পথভ্রষ্টদের পদরেণু হয়ে থাকতে ভালবাসবে?'

আবুল হাসান আলী

৩ আগস্ট, ১৯৪৯ ইং

১৬

ইন্তেকাল

আলী মিয়ার শেষ দিনগুলো

১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ ইং সালের মার্চ মাসে কুরবানীর সময়ে হযরত আলী মিয়া স্ট্রোক করেন। তখন তা সামলে উঠলেও নিকটজনেরা ভাবতে লাগলেন, এ হল সাময়িক সেরে ওঠা। যে কোন মুহূর্তে এ অমূল্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে। স্বয়ং হযরতও অনেক সময় ব্যথা ও দরদভরা কণ্ঠে বলে উঠতেন, 'হে আল্লাহ তোমার সাক্ষাৎ চাই।' কখনো বলতেন, 'এবার আমিও চলি।' 'হে খোদা! খাতেমা বিল খাইর কর।' কখনো বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সান্নিধ্যে তুলে নাও। এভাবে অসহায়ত্বের সাথে আর কতদিন?' জনৈক খাদেমকে বিভিন্ন সময় বলতেন, 'তোমাদের উপর অনেক বোঝা চাপিয়েছি, আর মাত্র কয়েকটি দিন।' কখনো বলতেন, 'এবার আমি চলি। আর মাত্র ক'টা দিন। আর মাত্র ক'টা দিন।'

শাবানের শুরুতে হযরত মাওলানার খাদেম ও চিকিৎসকদের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, হযরত এবার রমযান মাস কোথায় কাটাবেন? ভক্তদের পীড়াপীড়ি ছিল- হযরত আলী মিয়া যেন এবার নদওয়ায় রমযান মাসটি কাটান। অবশেষে বিষয়টি হযরতের ইচ্ছা ও মনোভাবের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

তিনি বললেন, রমযানের পূর্বে রায়বেরেলী যেতে হবে। সেমতে ২৭ শাবান তাকিয়া কেলায় গেলেন। ২৮ তারিখ সেখানে অবস্থান করে তিনি অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মাওলানা সাইয়িদ বেলাল হাসানীকে বললেন, আমাকে মসজিদে নিয়ে যাও। মসজিদের আঙ্গিনায় জায়নামায বিছিয়ে দেওয়া হল। তিনি দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। তারপর মসজিদের ভিতরে গেলেন। সেখানেও দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, নদীর দিকে নিয়ে চল। সেখানে নবনির্মিত সিঁড়িঘাটের উপর দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে নজর বুলিয়ে বললেন- মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ!

এরপর মসজিদের পিছনের দিকে নিতে বললেন, যেখানে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ র. এর সময় থেকে একটি পাথর বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার চিন্তায় আর সে ইচ্ছা পূরণ হল না। মসজিদ থেকে বের হতেই হযরত শাহ আলামুল্লাহ র. এর রওযা। সেখানেই হযরতের পিতামাতা, ভাই-বোনসহ আরো অনেক বুযুর্গ চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। সিঁড়ির পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মরহুমদের উদ্দেশ্যে সওয়াব রেসানী করলেন। এরপর সেখান থেকে ফিরে ক্লান্তি সত্ত্বেও বাড়ির ভিতর গেলেন। সেখানে বাড়ির মহিলারা সকলেই ছিলেন। সাথে হযরতের ভাগ্নে হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী ছিলেন। পনের মিনিট পর বাড়ি থেকে বের হয়ে বাংলোয় আসলেন। যোহর নামাযের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আসরের নামায ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় করলেন। এরপর বাড়ির ভিতরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর লাখনৌ রওয়ানা হন।

প্রথম রমযান শুরু হলে তিনি বললেন- 'জানি না পুরো রমযান পাই কি না। হে আল্লাহ! তুমি পুরো রমযানের বরকত দিয়ে ধন্য কর।' তারপর তিনি বললেন, 'ওষুধে যা করতে পারে না, রমযানে তা সিদ্ধ হয়।'

রমযানের শেষ দশক রায়বেরেলিতে কাটাবার ব্যাপারে তিনি চিকিৎসকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। ডাক্তার নজর, ডাক্তার আব্দুল মাবুদ, ডাক্তার সাইয়িদ কামরুদ্দীন ও ডাক্তার কর্ণেল শামছী এ পরামর্শে শরীক ছিলেন।

২০ রমযান ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং বিরাট এক বহর নিয়ে রায়বেরেলী রওয়ানা হন। এখানে ইতেকাফকারী লোকজনে মসজিদে ভরে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মসজিদে কতজন লোক? মাওলানা সাইয়িদ বেলাল হাসানী বললেন, মসজিদ ভরে গেছে। হযরত বললেন, এ প্রতিষ্ঠাতার ইখলাস! রাতে তারাবীহের পরে তিনি যথারীতি মজলিসে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। হযরতের যেসব গ্রন্থ দামেস্ক থেকে ছেপে এসেছিল, তা দেখে তিনি বললেন, এসব আল্লাহ তা'আলাই লিখিয়েছেন।

হযরতের এক খাদেম বিদেশ সফর করে এসেছিলেন। তিনি জানালেন, জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি তুরস্কের এক প্রকাশক ও অনুবাদককে সাতাশ হাজার ডলার দিয়েছেন হযরতের রচনাগুলো প্রকাশ করে তুর্কিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। আলী মিয়া এ খবরে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। মজলিসে العاقبة للمتقين সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, পরিণাম শুভও হয়, অশুভও হয়। শেষে প্রশ্ন করলেন, কাল কি জুম'আতুল বিদা?

অন্তিম যাত্রাপথে

২২ রমযান ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ঈসায়ী শুক্রবার আলী মিয়া দৈনন্দিন কাজগুলো সমাধা করেন। সাড়ে নয়টায় ঘুম থেকে জেগে ইস্তেঞ্জা করেন। অযু করে নফল নামায আদায় করেন। এরপর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন। তিলাওয়াতে সিজদাও আদায় করেন।

লাখনৌতে তিনি কুরআন মজীদ খতম করেছিলেন। শেষদিনে তেরতম পারা পাঠ করেন। মাওলানা সাইয়িদ জাফর মাসউদ হাসানী উপস্থিত হয়ে হযরত মাওলানার তাকিয়া কেলায় শুভাগমনে তাকিয়ার লোকজনের আনন্দের কথা তাকে জানান এবং বলেন, আপনি আগমন করলে এখানে বসন্তের নৈসর্গিক বাতাস বয়ে যায়। হযরত বললেন, এ হল তাকিয়ার বিশেষত্ব, ইনশাআল্লাহ তা অব্যাহত থাকবে। হযরত বললেন, এত প্রকট শীতের মধ্যেও আপনি এসে গেলেন। তিনি বললেন, আমি তো হযরতের সাথে ওয়াদা করেছিলাম। তিনি আরও বললেন, আমি

সাথে করে অক্সিজেন ও মনিটরও নিয়ে এসেছি। যাতে হযরতের কোন কষ্ট না হয়। একথা শুনে হযরত মুঁচকি হাসলেন।

অনেক বছর ধরে হযরতের চুল ছাটতেন সাবের। তিনি এসে আলী মিয়ার চুল ছেঁটে দিলেন। এরপর তিনি গোসলের প্রস্তুতি নিলেন। হযরতের খাদেম যাকাউল্লাহ খান বলেন, গোসলখানায় যাওয়ার পূর্বে হযরত প্রশ্ন করলেন, আজ কি ২২ রমযান? আবার বললেন, জুমআর নামায কি পনের মিনিট দেরী করে পড়া যায়? হযরতের খাদেম আলহাজ্জ আব্দুর রাযযাক বললেন, হযরত বললে দেরি করা যাবে। সাড়ে এগারটায় আলী মিয়া গোসলখানায় গেলেন। পনের মিনিটে গোসল সেরে কাপড় পরলেন। শেরওয়ানীর বোতাম লাগিয়ে দিলেন সাইয়িদ বেলাল হাসানী। এরপর তিনি বললেন, তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। নামায পনের মিনিট দেরী করাবে। আমি এখন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করব। এ সূরা তিলাওয়াতের অভ্যাস তার আট বছর বয়স থেকে। একথা বলে তিনি বিছানায় বসলেন। কিন্তু তিনি সূরা কাহাফের পরিবর্তে সূরা ইয়াসিন পাঠ করতে লাগলেন। সম্ভবতঃ দশ-বারো আয়াত পড়া হয়েছিল। হঠাৎ করে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আয়াতটি ছিল فبشره بمغفرة واجر كريم । যেভাবে বসেছিলেন তা থেকে একটু পিছন দিকে হেলে পড়লেন। মাওলানা বেলাল হাসানী মাথা এবং খাস খাদেম হাজী আব্দুর রাযযাক পা ধরে খাটে শুইয়ে দিলেন। ডাক্তার সাইয়িদ কমরুদ্দীন ও ডাক্তার আব্দুল মাবুদ খান নিকটেই ছিলেন। তারা অক্সিজেন লাগালেন। শিরায় ইনজেকশন দেওয়া গেল না, তাই কোমরে দেওয়া হল। ডাক্তার সাইয়িদ কামরুদ্দীন বুকে একটি ইনজেকশন দিলেন। হাত দিয়ে বুকে মালিশ করলেন এবং মুখ দিয়ে বাতাস দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আল্লাহর পথের মুসাফির এ সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তখন বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। এ শোক সংবাদ দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং ভক্ত-অনুরক্ত, শুভানুধ্যায়ী ও স্বজনরা দলে দলে উন্মাদ হয়ে রায়বেরেলী পৌঁছাতে লাগল। মাওলানা সাইয়িদ হামযা হাসানী নদভী এ মর্মন্তুদ মুহূর্তে গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফনের সকল কাজ সম্পন্ন করেন।

মাগরিবের পরে সাতটা থেকে পৌনে দশটা পর্যন্ত শেষবারের মত আলী মিয়াকে দেখার জন্য লোকদের ভিড় লেগে যায়। সময় যতই এগিয়ে চলল, ততই ভিড় বাড়তে লাগল। জানাযার নামায দশটায় হবে বলে পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেমতে ঠিক পৌণে দশটায় জানাযা উঠানো হয়। দু'মিনিটের পথ অতিক্রম করতে পঁচিশ মিনিট লেগে যায়। মসজিদের ভিতরে মিম্বরের পাশেই জানাযা রাখা হয়। মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

সাড়ে দশটায় হযরতের লাশ মোবারক কবরে নামানো হয়। তাকে সমাহিত করা হয় শাহ আলামুল্লাহ কবরস্থানে। এখানে সর্বশেষ কবরের জায়গাটি তার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

১৭

আলী মিয়ার বক্তৃতা থেকে

দ্বীনী মাদরাসার পরিচয়

মাওলানা আলী মিয়া নদভী র. দ্বীনী মাদরাসার পরিচয় দিতে গিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের উলামা ও তোলাবা সম্মেলনে বলেছিলেন-

'মাদরাসা হল এক মহান কর্মশালা, যেখানে মানুষ গড়ার সাধনা হয়। যেখানে দ্বীনের দাঈ ও ইসলামের সিপাহী তৈরী হয়। মাদরাসা হল ইসলামী বিশ্বের বিদ্যুৎকেন্দ্র, যেখান থেকে ইসলামী জনপদে বরং সমগ্র মানব বসতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। মাদরাসা হল মন ও মস্তিষ্ক এবং অন্তর ও অন্ত দৃষ্টি তৈরীর কারখানা। গোটা বিশ্বের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ এবং সমগ্র মানব জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের মহান কেন্দ্র। সমগ্র বিশ্বের উপর তার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, বিশ্বের কোন সিদ্ধান্ত তার ওপর কার্যকর হয় না।

মাদরাসার সম্পর্ক বিশেষ কোন যুগ, সমাজ এবং বিশেষ কোন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নয়, বিশেষ

কোন কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গেও নয়। সুতরাং যুগ ও সমাজের পরিবর্তন, ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি কিংবা সভ্যতার প্রাচীনতা মাদরাসার গতি ও ব্যাপ্তিকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না। আমরা যাকে মাদরাসা বলি, একদিকে তার সম্পর্ক সরাসরি মুহাম্মাদী নবুওয়াতের সঙ্গে– যা বিশ্বজনীন, সার্বজনীন ও সর্বকালীন। অন্যদিকে তার সম্পর্ক মানুষ ও মানবতার সাথে এবং সেই গতিশীল জীবনের সাথে, যা সাগরমুখী নদীর মতই চিরপ্রবাহমান। মাদরাসা হচ্ছে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর চিরন্তনতা ও মানবজীবনের গতিশীলতার মিলন মোহনা। সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীনের বিতর্ক এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতা এখানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ! মাদরাসার পরিচয় প্রসঙ্গে যদি বলা হয়, তা বিগত যুগের স্মারক কিংবা ইতিহাসের ধারক; তাহলে এর চেয়ে আপত্তিকর ও অপমানজনক বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি তো এটাকে মাদরাসার নিজস্ব সত্তার আমূল বিকৃতি মনে করি। মাদরাসাকে আমি মনে করি সবচেয়ে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী কেন্দ্র এবং গতি ও প্রগতির উচ্ছলতায় এবং উদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। এর এক প্রান্তের সংযোগ নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সঙ্গে, অন্য প্রান্তের সংযোগ জীবন ও জগতের সাথে। মাদরাসা একদিকে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর চিরন্তন ঝর্ণাধারা থেকে পানি সঞ্চয় করে, অন্যদিকে জীবনের ফসলভূমিতে সে পানি সিঞ্চন করে। এটা দ্বীনী মাদরাসার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। মুহূর্তের জন্য যদি সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে, তাহলে জীবনের ফসলভূমি শুকিয়ে যাবে, মানুষ ও মানবতা নির্জীব হয়ে পড়বে এবং জীবন ও জগতের সব কিছুতেদেখা দেবে স্থবিরতা।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর ঝর্ণাধারা যেমন কখনো শুকাবে না, তেমনি মানবতার পিপাসাও কখনো দূর হবে না। নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর কল্যাণ ও বদান্যতায় যেমন কৃপণতা ও দানবিমুখতা নেই, তেমনি মানবতার প্রয়োজন ও প্রার্থনারও বিরাম নেই। এদিক থেকে বারবার ধ্বনিত হয়– আল্লাহ দেন, আমি বিতরণ করি- এই আশ্বাস বাণী। ওদিক থেকে উচ্চারিত হয়– দাও, আরো দাও। চাহিদার কাতর ধ্বনি। দুনিয়াতে মাদরাসার চেয়ে কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত সচল প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে! জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন অসংখ্য। জীবনের চাহিদা ও পরিবর্তন অসংখ্য। জীবনের বিচ্যুতি ও পদস্খলন অসংখ্য। জীবনের আশা ও

উচ্চাকাঙ্খা অসংখ্য এবং জীবনের প্রতারণা ও প্রতারকও অসংখ্য। মাদরাসা যখন এমন সমস্যাসঙ্কুল ও প্রয়োজনবহুল জীবনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে, তখন তার অবসর যাপনের অবকাশ আর কোথায়?

দুনিয়াতে যে কোন মানুষ কাজ ছেড়ে আরাম করতে পারে। যে কোন প্রতিষ্ঠান অবসর যাপন করতে পারে। পৃথিবীতে সবার ছুটি ভোগ করার অধিকার আছে। কিন্তু মাদরাসার নেই কোন ছুটি। প্রতিটি দিনই তার কর্মদিন, প্রতিটি মুহূর্তই তার ব্যস্ততার মুহূর্ত। দুনিয়ার যে কোন মুসাফির চাইতে পারে একটু আরাম, একটু বিশ্রাম। কিন্তু জীবনের সদা চলমান কাফেলায় মাদরাসা নামের যে মুসাফির, তার কপালে নেই কোন আরাম, চলতে হবে তাকে অবিরাম। জীবনের গতি কখনো যদি মুহূর্তের জন্য থেমে যেত, চাহিদা ও প্রয়োজনের সাময়িক অবসান হত, তাহলে মাদরাসারও সুযোগ ছিল চলার পথে একটু দম ফেলার, একটু জিরিয়ে নেওয়ার। কিন্তু জীবন যেখানে সদা গতিশীল, জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজন যেখানে সদা পরিবর্তনশীল, সেখানে মাদরাসার কর্মচঞ্চলতার স্থিরতা ও স্থবিরতার অবকাশ কোথায়? তাকে তো পদে পদে জীবনকে শাসন করতে হবে, জীবনের ভুল-বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে হবে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং নতুন নতুন ফেতনার সফল মোকাবেলা করতে হবে।

মাদরাসা যদি জীবন কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে কিংবা কোন মঞ্জিলে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এবং তন্দ্রায় ঢলে পড়ে, তাহলে জীবনকে সঙ্গ দেবে কে? মানবতাকে পথ দেখাবে কে? ঝড়-তুফানের অন্ধকারে নবুওয়াতের আলো দেখাবে কে? মাদরাসা যদি কর্মে অবহেলা ও দায়িত্বে শিথিলতা করে, মাদরাসা যদি জীবনের নেতৃত্ব ত্যাগ করে এবং গতিহীন ও স্থবির হয়ে পড়ে, তাহলে তা হবে জীবন ও জগতের সাথে এবং মানুষ ও মানবতার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের শামিল, যা দায়িত্বশীল ও কর্তব্যসচেতন কোন মাদরাসা কল্পনাও করতে পারে না।"

সমাজের সঠিক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা

পরিবর্তিত সময়ে সঠিক নেতৃত্ব দিতে হলে দ্বীনী মাদরাসার ছাত্রদের কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে এক দিক নির্দেশনামূলক ভাষণে হযরত আলী মিয়া র. বলেন–

“আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এত দিনে সময় ও সমাজ এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এখন যদি আমাদের আল-ইসলাহ্ আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য হয় শুধু মাঝারি মানের কিছু লেখক-গবেষক ‘উৎপাদন’, যারা সময়ের পরিবর্তন ও প্রবণতা অনুসরণ করে এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের কলমের লেখা ও চিন্তার রেখা অনুধাবন করে তার মোকাবেলায় কিছু বলতে বা লিখতে পারে, তাহলে আমার কাছে শুনুন, চলমান সময়ের জন্য তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সময়ের দাবী ও চাহিদা এখন অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত।

সময়ের দাবী ও চাহিদা সর্বদা একই স্থানে স্থির থাকে না বরং পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের যোগ্যতা-সামর্থ্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিচারে চাহিদার মান ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী উলামায়ে উম্মতের কাছে পথের দিশা ও দিক-নির্দেশনা দাবী করে। সময় এখন কোন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শুধু এজন্য ছাড়পত্র দিতে প্রস্তুত নয় যে, এখানে কিছু ভালো লেখক বা বক্তা তৈরী হচ্ছে এবং মাঝারি মানের সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও আলেম তৈরী হচ্ছে।

শুনুন ভাইসব! মুসলিম সমাজের চিন্তা-জগতে আজ এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই উম্মাহ এবং এই দ্বীনের মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে যুবসমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক অনাস্থা-অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠেছে। সর্বোপরি দ্বীনের ধারক-বাহক আলেমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক হতাশা ও হীনম্মন্যতা শিকড় গেড়ে বসেছে। এগুলো দূর করে যুগ ও সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য, দ্বীন ও শরীয়তকে নয়া যামানার নয়া তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন। আরো অনেক বড় ইলমী জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জনের প্রয়োজন।

এখন প্রয়োজন আরো আত্মনিবেদনের, আরো আত্মবিসর্জনের এবং আরো উর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নের। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ অনেক কালজয়ী কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন, বিশেষত আমাদের নদওয়াতুল উলামার প্রথম কাতারের লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদগণ তাদের সময় ও সমাজকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে পেরেছেন। যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তখন জ্বলন্ত ছিল, সেগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণার যে ফসল এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

তারা রেখে গেছেন, তা সে যুগের জন্য খুবই কার্যকর ও যুগান্তকারী ছিল। কিন্তু সেগুলোর চর্বিত চর্বণ এ সময়ের জন্য বিশেষ কোন কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে না এবং তাতে যুগ ও সমাজের হতাশাও দূর হবে না।

জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ইলমের যে প্রাচীন ভাণ্ডার ও গুপ্ত সম্পদ পূর্ববর্তী আলেমদের কল্পনায়ও ছিল না, আধুনিক প্রকাশনা বিপ্লব এবং বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন দিনের আলোতে চলে এসেছে। আগে যে সব কিতাবের শুধু নাম শুনেছি, এখন তা গ্রন্থাগারের তাকে তাকে শোভা পায়। তাছাড়া চিন্তার পথ ও পন্থা এবং অস্থির চিত্তকে আশ্বস্ত করার উপায়-উপকরণের এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পুরোনো পথ ও পন্থার অনুকরণ করা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। পুরোনো বহু আলোচনা এখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

এক সময় মাওলানা শিবলী নুমানীর 'আল জিযয়া ফিল ইসলাম'কে মনে করা হত মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। 'এক নজরে আওরঙ্গজেব' তো ছিল রীতিমত এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়। একইভাবে 'আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার' ছিল ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙ্গা জবাব। কিন্তু এগুলো এখন এতই গুরুত্বহীন যে, এ সম্পর্কে বলার বা লেখার নতুন কিছু নেই এবং যুগ ও সমাজের তাতে তেমন কোন আগ্রহও নেই। এ যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি পেতে হলে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার প্রয়োজন। কেননা সময়ের কাফেলা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে অনেক সামনে।

অবশ্য পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া এই জ্ঞানসম্পদও নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে আছে স্মৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য। এগুলো আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ। কিন্তু সময় বড় নির্দয়। যামানা বড় বেরহম। কারও ব্যক্তিত্ব যত বিশাল হোক, প্রতিভার প্রভা যত সমুজ্জ্বল হোক এবং জামাত ও সম্প্রদায় যতই ঐতিহ্যবাহী হোক না কেন, সময় কারো সামনেই মাথা নোয়াতে রাজী নয়। যুগের স্বভাবধর্ম হল, যদি যোগ্যতাবলে তার স্বীকৃতি আদায় না করা হয়, আগে বেড়ে সে কাউকে স্বীকার করে না। কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সময় সবসময়ই এমনই বাস্তববাদী এবং এমনই শীতল ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারি কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলী

লাভ করা এত সহজ নয়। যথেষ্ট নয় এর জন্য শুধু ঐতিহ্যের দোহাই। সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে এবং আত্মগর্বী সমাজের মন-মগজে যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও যোগ্যতার আরও বড় প্রমাণ দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে হিমালয়ের শৃঙ্গকে।"

আরেকটি ভাষণ

আরেক ভাষণে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরত আলী মিয়া বলেন, "এখন সমস্ত মাদরাসায় একটি শূন্যতা বিরাজ করছে। তা হল, উস্তাদ-ছাত্রদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ন্যূনতম যোগাযোগ নেই। বরং উভয়ের মাঝে এক বিরাট ফারাক ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। তারা এখন শুধু দরসের ছাত্র এবং দরসের শিক্ষক হয়ে পড়েছে। এই সম্পর্কহীনতা ও দূরত্ব অবশ্যই দূর করতে হবে। উভয়ের মাঝে আত্মার সম্পর্ক এবং হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি করতে হবে। মাদারিসের অস্তিত্ব, ইলমের অগ্রগতি এবং তালিবে ইলমের কামিয়াবি নিহিত রয়েছে এখানেই।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে আপনাদের উপর নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়-

১. পাহাড়সম দৃঢ়-মজবুত ঈমান থাকতে হবে। হতে হবে এমন সাহসের অধিকারী, যাতে সারা দুনিয়ার বিনিময়ে হলেও কেউ আপনাদের ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় আদর্শ ক্রয় করার কল্পনাও করতে না পারে।

২. আপনাদের হৃদয়ে ঈমান সংরক্ষণ করার জযবা থাকতে হবে, এর উপর গর্ববোধ করতে হবে এবং সর্বান্তঃকরণে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

৩. আপনাদের অন্তরে ধর্মীয় সততা, যৌক্তিকতা ও চিরন্তনতার সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তার অসীম শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও নির্ভুলতার ইয়াকীন রাখতে হবে।

৪. আপনাদের নিজস্ব মতাদর্শের পরিপন্থী সবকিছুকে জাহেলিয়াতের মীরাস মনে করতে হবে।

৫. আপনারা আল্লাহর নির্দেশাবলী, রাসূলের হেদায়াত শোনার সাথে সাথে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবেন, سمعنا وأطعنا 'আমরা

শুনলাম ও মানলাম, তেমনিভাবে জাহেলিয়াতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তার নীতিমালার কথা শুনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে উঠবেন–

كفرنا بكم وبكم ويدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده

আমরা তোমাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। তোমরা যতদিন এক আল্লাহকে বিশ্বাস না করবে, ততদিন তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও সংঘাত বিদ্যমান থাকবে।' (সূরা মুমতাহিনা-৪)

৬. দুনিয়াতে ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ। রাসূলের আদর্শই একমাত্র শান্তির প্রতীক। তার অনুকরণেই রয়েছে সফলতা ও কামিয়াবীর চাবিকাঠি। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব লুকায়িত রয়েছে এরই মাঝে -এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করতে হবে। একথা তো বাস্তব সত্য যে, "মুহাম্মাদ আরাবীই হচ্ছেন সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র উৎসস্থল। কেউ যদি তার পদতলে নিজেকে বিলীন করতে না পারে, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।"

৭. ইলমে নবুওয়াতকে যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার-নির্যাস মনে করতে হবে, দুনিয়ার মানবরচিত বস্তুকেন্দ্রিক তত্ত্ব-দর্শন, যুক্তি ও তর্ক-জ্ঞান এসব কিছুকে কল্প-কাহিনীর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া যাবে না।

৮. আপনাদের কাছে তাওহীদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে এবং এর উপর অবিচল আস্থা রাখতে হবে। শিরক, কুফর ও প্রতিমা পূজার দর্শন যতই আকর্ষণীয় পন্থায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষায় উপস্থাপন করা হোক না কেন, সেগুলোকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। زخرف القول غرورا "অন্তঃসার শূন্য চাকচিক্যময় ভাষা" বলেই সেগুলোকে আখ্যা দিতে হবে।

৯. সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আপনাদের লালায়িত হতে হবে এবং রাসূলের আদর্শকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। বিদআত-কুসংস্কারের অসারতা ও ক্ষতি এবং আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ইয়াকীন রাখতে হবে।

মোটকথা, আপনাদের বিশ্বাস, মতাদর্শ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় তথা দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজকর্মে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর পরিব্যাপ্তি ফুটে উঠতে হবে।

দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে 'আসহাবে কাহ্ফ' তথা গুহাবাসীদের চমকপ্রদ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। সমকালীন বাচনভঙ্গি ও ধারায় এর শিরোনাম দেওয়া করা যায়, 'দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী'। (কারণ মুফাসসিরে কিরাম তাদের সংখ্যা সাত হওয়ার উপর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।) এ কাহিনীতে মানব গোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্মের জন্য রয়েছে এক বিশেষ পয়গাম ও উন্নত আদর্শ। যে পয়গাম সর্বকালীন ও সর্বজনীন, যার প্রতিক্রিয়া শুধু মনমস্তিষ্ককেই প্রভাবিত করে না বরং তার প্রতিভা, সাহসিকতা, উদ্যম ও সংকল্পের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা সঞ্চারে কার্যকরী হতে পারে। এ কাহিনী কখনো হৃদয় সিক্ত করে শিশির বিন্দু ঝরিয়ে, কখনো আঘাত হানে ফুল ও পাপড়ির চাবুক হয়ে। আমি আজ তরুণদের কাছে তরুণদের কাহিনীই শোনাতে চাই। বস্তুত আমি শোনাচ্ছি না বরং আল কুরআনই তা শোনাচ্ছে। আল-কুরআনই তাদেরকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তাদের চিরস্মরণীয় করে দিয়েছে সর্বযুগের জন্য। তাদের সমাসীন করেছে আইডিয়াল ও অনুসরণীয় আদর্শের আসনে। কাহিনী বিবৃত হয়েছে প্রাঞ্জল ভাষায়, সাবলীল ভঙ্গিতে ও সংক্ষেপে। কিন্তু তা খুবই শিক্ষণীয় ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ইরশাদ হয়েছে,

"ওরা একদল তরুণ, যারা তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল। আর আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের সৎ পথে চলার শক্তিকে। তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিয়েছিলাম তখন তারা (ঈমানের পথে চলতে) উদ্যত হল এবং বলল, আমাদের রব তো (তিনি, যিনি) আসমান ও যমীনের রব, আমরা কখনো তাকে ব্যতীত কোন মাবুদ (প্রতিমা) কে ডাকব না (ইবাদত করব না)। কেননা তা হলে তো আমরা অবশ্যই অন্যায় উক্তি করার অপরাধ করে ফেলব।" (সূরা কাহাফ : ১৩-১৫)

কি সেই তরুণদের প্রেরণা-

ইতিহাসখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ শামের ফিলিস্তিন এলাকায় একটি নতুন দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। তখন এ দাওয়াতের বাহক ছিলেন সাইয়িদুনা হযরত ঈসা মসীহ আ.। আমরা মুসলমানরাও তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করি। তিনি দাওয়াত দিলেন তাওহীদের, একত্ববাদের। সারা বিশ্ব তখন শিরক ও অনাচারের আধারে নিমজ্জিত। নিশ্ছিদ্র আঁধারের বুকে ক্ষীণ আলোর রশ্মিরূপে উদ্ভাসিত হল এক নতুন

পয়গাম। হযরত ঈসা আ. -এর কণ্ঠে উচ্চকিত হল এক অমীয় ধ্বনি। শিরক, বংশ পূজা তথা সাম্প্রদায়িকতা, প্রথা পূজা, কুসংস্কার, বস্তুবাদ ও মানবতার নির্যাতন শোষণের বিপরীতে তাওহীদ ও আল্লাহ পাকের নির্ভেজাল ইবাদতের উপরে রচিত হয়েছিল তার পয়গামের মূল ভিত্তি।

কতক মানুষ তার এ দাওয়াত কবুল করে তার ধারক-বাহকে পরিণত হল। নতুন ব্রত নিয়ে তারা নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর কাছে গিয়ে আত্মনিয়োগ করল দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে। এখানেই ওই তরুণদের ঈমান আনার কাহিনী তৈরী হয়।

পৃথিবীর বৈপ্লবিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত অভিজ্ঞদের তুলনায় জীবনী শক্তিতে উচ্ছল তরুণরাই নতুন ফলপ্রসূ আহ্বানে অধিকতর দ্রুত সাড়া দিয়ে থাকে। কেননা, অভিজ্ঞতা, লাভ-ক্ষতির চিন্তা, প্রথা-সংস্কার ও আশা-নিরাশা বয়স্কদের পথে বিরাট অন্তরায় ও বিপত্তি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে তরুণরা হয় সম্পর্ক, বন্ধন ও আসক্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত। তাই বিপ্লবী কর্মসূচীতে তরুণরাই অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্ছল ও অগ্রগামী। তারা সামান্য ধাক্কায় সকল বন্ধন ছিড়ে এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে।

আল-কুরআন এই তরুণদের নির্দিষ্ট কোন বয়সের কথা উল্লেখ করেনি এবং এটাই আল-কুরআনের প্রকাশভঙ্গি। কেননা যদি বলা হত, তারা ছিল ১৮-১৯ বছরের তরুণ, তাহলে এর চেয়ে কম বয়সের লোকেরা অজুহাত দেখিয়ে বলতে পারত, একথাগুলো আমাদের জন্য বলা হয়নি।" এজন্য আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'ইন্নাহুম ফিতয়াতুন' ওরা বয়সে তরুণদের একটি ছোট দল। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞরা জানেন, 'ফিতয়াতুন' শব্দে বয়সের তারুণ্যের সাথে সাথে মন-মেধা-মস্তিষ্ক, উচ্চাভিলাষ ও সংকল্পের তারুণ্য ও উচ্ছলতার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

তরুণ দল পৌঁছে গেল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে। যেখানে পতপত করে উড়ছে রোমান পতাকা। সে সাম্রাজ্যটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক সুসংহত, সর্বাধিক সমৃদ্ধ, সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উন্নীত এবং উন্নততর আইন ও শাসনতন্ত্রে পরিচালিত পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক বিস্তৃত সাম্রাজ্যরূপে স্বীকৃত। এই সাম্রাজ্য ও তার সম্রাটদের নাকের ডগায় সরাসরি মুখের উপর জনসমুদ্রের ভিড়ে দাঁড়িয়ে এই ক্ষুদ্র সংখ্যক তরুণ স্লোগান তুলল। নিজেদের সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে তার প্রচারে

ব্রতী হল। কী অদম্য সাহস ও উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল সে তরুণ হৃদয়গুলো! তাদের গৃহীত মতাদর্শই ছিল তখনকার বিশুদ্ধ মাযহাব, সে যুগের খাঁটি দ্বীন বা ধর্ম। কেননা খৃস্টবাদ তখন পর্যন্ত ছিল ভেজাল ও বিকৃতিমুক্ত। আহবায়ক দল, হযরত ঈসা আ. -এর পয়গামের একনিষ্ঠ পতাকাবাহী দলটি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে উপনীত হয়ে ঘোষণা দিল, আমাদের রিযিকদাতা, আমাদের প্রতিপালন ও জীবন ধারণের ব্যবস্থাপক হুকুমত নয়, সম্রাট নয়। আমাদের রিযিকদাতা প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ।

কুরআনের ভাষায়, "আমাদের রব (তিনিই, যিনি) আসমানসমূহ ও যমীনের রব, মালিক। আমরা কখনো তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে মাবুদ সাব্যস্ত করে ডাকব না। (তেমন করলে তো) আমরা তখন অন্যায় অযৌক্তিক কথা বলে ফেলতাম। এই যে আমাদের কওম (স্বগোত্র), এরা তাকে বর্জন করে আরো অনেক বিষয়কে পূজনীয় সাব্যস্ত করে রেখেছে। এরা ওদের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট প্রমাণ কেন পেশ করছে না? সুতরাং আল্লাহর নামে যারা মিথ্যা আরোপ করে, তাদের চেয়ে অধিক অনাচারী আর কে?" (সূরা কাহফ : ১৪-১৫)

এখানে আল-কুরআন আরেকটি তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে। সেটি হল, সফলতা লাভের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের। দাঈদের সাহসিকতার সাথে প্রথম পদক্ষেপ পূর্ণ হলে আল্লাহ পাকের মদদ আসে তার সহায়তায়। তাই ইরশাদ হয়েছে, 'আমানূ বিরাব্বিহিম ওয়া যিদনাহুম হুদা।' (তারা তাদের কর্তব্য পালন করে অগ্রগামী হল, তারা তাদের রব এর উপরে ঈমান আনল আর (আমার মদদ তখন সাব্যস্ত হল।) আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিলাম।' অন্য আয়াতে রয়েছে, 'ওয়াল্লাযীনা জাহাদূ ফীনা লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা' অর্থাৎ 'আমার (দীনের) পথে যারা সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদের সন্ধান দেব আমার পথের।'

মানুষ যদি প্রতীক্ষায় থাকে, কোন বিষয়ে কোন বাণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে কিংবা তাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যাবে, তবে তা চরম বোকামী ছাড়া কিছু নয়। প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেকেই, হিম্মত ও সাহসিকতার সূচনা করতে হবে পথ চলার। তবেই হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে মহান রাব্বুল আলামীনের মদদ ও সহায়তা। তাই ইরশাদ হয়েছে, 'ওয়া রাবাতনা আলা কুলূবিহিম।' অর্থাৎ- '(তারা অগ্রগামী হল)। আমি তাদের মনের জোর ও উদ্যমকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করলাম।' কারণ, সে যুগের পরাশক্তি ও পরাক্রমশালী সরকার ও সম্রাটদের সাথে ছিল তাদের

প্রতিযোগিতা। তারা নিয়েছিল সরকারি মতবাদ ও ধর্ম বর্জন করে একটি নতুন দ্বীনের দীক্ষা।

এটাই আল-কুরআনের বর্ণিত আসহাবুল কাহফ (গুহাবাসী)-এর ঘটনা। জর্দানের পূর্বাঞ্চল সফরকালে (১৯৭৩) আমার সে গুহা দেখার সুযোগ হয়েছে, যে গুহায় তারা আরামে ঘুমাচ্ছেন। জর্দান প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের মহাপরিচালক গবেষক বন্ধুবর ওয়াফা আদ-দাজ্জানী সাথে থেকে আমাকে সে গুহা পরিদর্শন করিয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণ দ্বারা সে গুহাটিই আসহাবুল কাহাফের আলোচ্য গুহা বলে প্রমাণ করেছেন।

সূরা কাহাফে বিবৃত তরুণদের জীবনকর্মে জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিপদসংকুল কর্মপ্রান্তরে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও আশা-বাসনা জলাঞ্জলি দিলেই কোন জাতি রক্ষা পাবে বিপর্যয় ও বিনাশের চরম হুমকি থেকে। আর একটু সাহসিকতা ও উদারতা নিয়ে অগ্রগামী হলে আশা পোষণ করা যাবে মানবতার কল্যাণ সাধনের। কবি আকবর ইলাহাবাদী যথার্থই বলেছেন,

'নায কেয়া ইস পে জো বদলা হ্যায় যামানে তুমে,
মর্দ ওয়াহ হ্যয় জো যামানে কো বদল দেতে হ্যায়।

'যুগের স্রোতে ভেসে চলেছে, এ নয় গৌরব আপনার, কালের প্রবাহ রুখে দেয় যে পুরুষ, তারই মাথায় পরাও গৌরব মুকুট।'

অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা গর্ব ও গৌরবের বিষয় নয় বরং যুগধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে মানব কল্যাণে প্রবাহিত করাই পৌরুষদীপ্ত তরুণের অবদান।

মাদরাসা শিক্ষা সমাপনকারীদের উদ্দেশ্যে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই একটি শিক্ষাকাল নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেও তা সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আপনাকে বলতে চাই তা হল, শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন কখনো সমাপ্ত হতে পারে না। তালিবে ইলম কখনো তলবে ইলম (জ্ঞান অন্বেষণ) থেকে ফারিগ হতে পারে না। আল্লাহ না করুন, আপনি যদি শিক্ষা-সমাপ্তির অর্থ এই মনে করে থাকেন যে, তালিম ও শিক্ষা অর্জন থেকে আপনি ফারিগ হয়ে গেছেন। অধিক তালিম ও তরবিয়াতের আপনার প্রয়োজন নেই। শিক্ষা-দীক্ষায় আপনি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা আপনি নির্ধারিত শিক্ষা-সমাপ্ত করেছেন, তাহলে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ

ছাড়াই পরিষ্কার ভাষায় আমি বলব, আপনি কিছুই শিখতে পারেননি। আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর আমরা যারা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম, আমরা হয়েছি সর্বস্বান্ত।

তবে আপনাদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমার বিশ্বাস, শিক্ষা সমাপ্তির এবং তালিম থেকে অবসরতার এই গলদ অর্থ আপনারা গ্রহণ করেননি বরং আপনাদের মহান পূর্বসূরীদের কাছে এর যে অর্থ ও মর্ম ছিল, আপনারাও তাই বুঝেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন।

সুযোগ্য পূর্বসূরীর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আপনারাও নিশ্চয় বিশ্বাস করেন, ফারিগ হওয়ার অর্থ হল, শিক্ষা লাভের এমন এক স্তরে আপনারা উপনীত হয়েছেন, এখন যে কোন বিষয়ে কিতাব হাতে নিতে পারেন এবং সাহস করে জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়ে প্রয়োজনীয় মণি-মুক্তা তুলে আনতে পারেন বরং এভাবে বলাটাই অধিক সঙ্গত হবে যে, জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আপনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আপনি এখন যে কোন তালা খুলতে পারেন এবং যত ইচ্ছা জ্ঞান-সম্পদ আহরণ করতে পারেন। এই চাবি আপনি যত বেশি ব্যবহার করবেন, তত বেশি লাভবান হবেন, তত বেশি বিদ্বান ও বিত্তবান হবেন।

যে কোন নেসাব ও পাঠ্যব্যবস্থার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। আমাদের দ্বীনী মাদারেসের নেসাব ও পাঠ্যব্যবস্থা যদি তার শিক্ষার্থীর মাঝে 'আমি কিছু না' -এই অজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি করে দিতে পারে তাহলেই নেসাবের উদ্দেশ্য সফল। তবেই এতসব উদ্যোগ আয়োজন এবং এতসব শ্রম ও পরিশ্রম স্বার্থক।

'অজ্ঞতা' শব্দটি হয়ত অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু পূর্ণ সচেতনভাবেই শব্দটির উপর আমি জোর দিতে চাই। আধুনিক যুগের মানুষ 'সুশীল' ভাষায় এটাকেই 'জ্ঞানমনষ্কতা' বলে।

এই অজ্ঞতাবোধ কিংবা জ্ঞানমনষ্কতা যদি আপনার মাঝে জাগ্রত হয়ে থাকে তাহলেই আপনি সফল। আপনার শিক্ষা জীবন স্বার্থক। আমি আপনাকে, আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবং আপনাকে গড়ে তোলার কারিগরদেরকে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাব।

এ ভূমিকা নিবেদনের পর সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি আমার বিদায়ী ভাইদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা আরয করব এবং আপনাদের সজাগ দৃষ্টি ও পূর্ণ মনোযোগ আশা করব।

এক. ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত

মুসলমানদের যিন্দেগীর কামিয়াবীর প্রথম কথা হল, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত। বড় বড় বুযুর্গানে দ্বীন, ইমাম ও মুজতাহিদীন এবং জ্ঞানসাধক ও যুগ সংস্কারক মোটকথা পৃথিবীতে যারা অমর হয়েছেন এবং ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম স্বর্ণোজ্জ্বল হয়েছে, যদি তাদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ইখলাসই ছিল তাদের জীবন বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অনন্য প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লিল্লাহিয়াত ও আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনই তাদের প্রতিটি কর্ম ও কীর্তিকে এমন অমরত্ব দান করেছে। দরসে নেযামীর স্থপতি ও প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীনের কথাই ধরুন। দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে দরসে নেযামীর অপ্রতিহত প্রভাব যুগ যুগ ধরে শুধু পাক-ভারতে নয়, পৃথিবীর আরো দূর দূরাঞ্চলেও অব্যাহত রয়েছে। এত এত সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে পাল্টে দেয়া সম্ভব হয়নি। কিসের জোরে, কিসের বলে? এটা শুধু জ্ঞান-প্রতিভা ও বুদ্ধি প্রজ্ঞার বলে নয়। কেননা তার সময়কালে বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এমন ছিল, যারা ছিলেন মেধা ও প্রতিভায় এবং জ্ঞানে ও গুণে তার থেকে অগ্রসর, অন্তত সমকক্ষ তো অবশ্যই। কিন্তু কী তার রহস্য যে, মোল্লা নিযামুদ্দীন আজও জীবন্ত। অথচ অন্যদের আলোচনা পর্যন্ত বিলুপ্ত বরং তাদের নাম উচ্চারিত হয় এই সুবাদে যে, তারা ছিলেন তার সমসাময়িক!

যদি আপনি চিন্তার সঠিক রেখায় অগ্রসর হন এবং তার জীবন ও কর্মের গভীরে প্রবেশ করেন, তাহলে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের মহাশক্তিকেই ক্রিয়াশীল দেখতে পাবেন। ইখলাস এবং একমাত্র ইখলাসই মোল্লা নিযামুদ্দীনকে অমরত্ব দান করেছে।

বস্তুত সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবন থেকে 'কিছুই জানি না'র শিক্ষাটুকু তিনি অর্জন করেছিলেন। আর এই 'অজ্ঞতাবোধ' তাকে এমনই অস্থির করে তুলেছিল যে, সে যুগের এক উম্মী বুযুর্গ ও নিরক্ষর সাধক পুরুষের দুয়ারে গিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন, যিনি অযোধ্যার ছোট্ট এক অখ্যাত পল্লীতে ইখলাসের ধন-রত্ন নিয়ে বসেছিলেন। 'জ্ঞান-গরিমা' বিসর্জন দিয়ে নিজেকে মোল্লা নিযামুদ্দীন সেই উম্মী সাধকের সাথে জুড়ে দিলেন এবং তার পদসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এ বিসর্জনই ছিল তার সকল অর্জনের উৎস।

দুই. ত্যাগ ও কুরবানী

দ্বিতীয় যে কথাটি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, তা হল ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা। বস্তুতঃ ত্যাগ ও কুরবানী এবং পণ ও প্রতিজ্ঞা এমনই

মহাশক্তি, তা যদি ব্যক্তির মাঝে জাগ্রত হয় তাহলে তাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। যদি তা প্রতিষ্ঠান অথবা সম্প্রদায়ের মাঝে সৃষ্টি হয়, তা হলে গোটা পৃথিবী সে প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন থেকে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যে নীতি ও আদর্শ আপনি অর্জন করেছেন, তার জন্য আপনার জীবন-যৌবন এবং আপনার বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবকিছু কুরবান করুন। নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করুন। তারপর দেখুন, কোথায় কোন মাকামে আল্লাহ্ আপনাকে পৌঁছে দেন।

তিন. আত্মযোগ্যতা

জীবনের সফলতার জন্য তৃতীয় বিষয় হলো মানুষের আত্মযোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভা। মানুষ যদি তার আত্মযোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে পারে, তাহলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। যুগে যুগে এটাই ছিল মানুষের উন্নতি, অগ্রগতি ও অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ।

আমাদের সব সময়ের একটি সহজ অনুযোগ হল, 'যামানা বদলে গেছে'। কিন্তু আপনি যদি ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত, ত্যাগ ও কুরবানী এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার সমাবেশ ঘটাতে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন, যুগের কোন পরিবর্তন ঘটেনি বরং সময় ও সমাজ এখনো আপনাকে বরণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

পক্ষান্তরে এই তিন পাথেয় ছাড়া যার জীবন সফর শুরু হবে, পৃথিবীর যেখানেই সে যাবে এবং ডিগ্রী ও সনদের যত বাহারই দেখাবে, সময় ও সমাজের কাছে সে শুধু অবজ্ঞাই পাবে। আমি আবারো বলছি, এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি যদি অর্জন করতে পারেন, তাহলে আলমগীরের যামানা, নিযামুল মুলক তূসীর যামানা, ইমাম গাযালী, ইমাম ইবনে কাইয়্যেম ও ইমাম ইবনে তায়মিয়ার যামানা আজও আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে। সেই সোনালী অতীত আবার ফিরে আসতে পারে শুধু আপনারই জন্য।

এ ধারণা অবশ্যই ভুল যে, সময় আগে থেকে জায়গা খালি করে কারও অপেক্ষায় বসে থাকবে। আর তিনি যথাসময়ে সেই সংরক্ষিত আসনে বসে পড়বেন। না, এমন কখনো হয়নি। আর কখনো হবেও না। লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময় বড়ই বাস্তববাদী ও অনুভূতিপ্রবণ। সময়ের নীতি হল- যোগ্যতারই টিকে থাকার অধিকার রয়েছে। অযোগ্যতার তো প্রশ্নই আসে না। সময় এত নির্মম যে, যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে যোগ্যতরের এবং উপযোগীর পরিবর্তে অধিকতর উপযোগীর সে পক্ষপাতি।

মোটকথা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও উপযোগিতা যদি থাকে, তাহলে যে কোন সময় ও কাল আপনার অনুকূল এবং যে কোন সমাজ ও সম্প্রদায় আপনার জন্য ব্যাকুল। সময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে নিজেদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতাকে আড়াল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং হীনম্মন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। সময় ও কালের কোন পরিবর্তন হয়নি, হয়েছে আমার ও আপনার। আমরা বদলে গেছি। সে যুগের ইখলাস ও তাকওয়া এ যুগে নেই। তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা আমাদের মাঝে নেই। প্রতিভা ও আত্মযোগ্যতা বিকাশের যে চেষ্টা-সাধনা তাদের মাঝে ছিল, তা আমাদের মাঝে নেই। সেই যুগ, সেই কাল এখনো আছে; নেই শুধু সেই যোগ্যতা ও সাধনা অর্থাৎ পরিবর্তন এসেছে আমাদের মাঝে। সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি আদায় করতে হলে আমাদের মাঝেই পরিবর্তন আনতে হবে।

আমি আশা করি, যে সকল প্রিয় তালেবানে ইলম আজ বিদায় গ্রহণ করে জীবনের নতুন সফর শুরু করছেন, আগামী কর্মজীবনে তারা এই মূলনীতিগুলো গ্রহণ করবেন। পক্ষান্তরে যাদের সামনে এখনও সময়-সুযোগ আছে, আরও কয়েক বছর যাদের ছাত্রজীবন আছে, তারা এই উজ্জ্বল মূলনীতি থেকে আরও বেশি কল্যাণ আহরণে সচেষ্ট হবে।

প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে

প্রিয় ভাইয়েরা, আমি মূলতঃ ইতিহাসের ছাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস, এ ভূখণ্ডে ইসলামী উম্মাহর এই বিরাট জনসংখ্যার উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ফসল। যদি রাজনৈতিক স্বার্থের আবর্জনামুক্ত ইখলাস, মুহাব্বত, আল্লাহর দাসত্ব ও মানবপ্রেমের মত মহান গুণাবলী না হত তবে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে বিশ্বাসী একজন মুসলমানেরও অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। একজন সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করাও আজ আমাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হয়। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষগণ কত সহজেই না লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন! ঈমান ও ইখলাসের আলো জ্বেলে শতাব্দীর অন্ধকার মুহূর্তে দূর করে দিয়েছিলেন!

ভূস্বর্গরূপে পরিচিত গোটা কাশ্মীর ভূখণ্ডই হযরত আমীর-ই-কবীর সৈয়দ আলী হামদানীর প্রেম ও ভালবাসার ফসল। আল্লাহর এই প্রেমিক বান্দা ইরান থেকে এলেন। কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আস্তানা গাড়লেন। আর দেখতে দেখতেই ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরীর

হৃদয় জয় করে নিলেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত দলে দলে ছুটে এসে তার হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করে নিল। তাদের হৃদয়ে ঈমান, ইখলাস এবং প্রেম ও পুণ্যের এক অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠল। এটা ছিল ইখলাস, আধ্যাত্মিকতা ও আবদিয়াত তথা আল্লাহর প্রতি দাসত্ববোধ ও মানবপ্রেমেরই বিজয়।

আল্লাহর দাসত্ব ও মানবপ্রেম যখন সম্মিলিত হয়, এ দুটি উচ্ছল নদীর স্রোতধারার যখন সঙ্গম ঘটে, একজন মানুষ যখন আল্লাহর দাসত্ব ও মানবপ্রেমের শীতল স্নিগ্ধ সরোবরে অবগান করে পূতঃপবিত্র হয়ে ওঠে, তখন তার বিজয় ও অগ্রযাত্রা হয় অপ্রতিরোধ্য। ঈমানী নূরের রেখা তখন অন্ধকারে বুক চিরে মানুষের হৃদয় রাজ্যের পানে নিজেই নিজের পথ করে নেয়। আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেম এমনি এক মহাশক্তি যে, দেশের পর দেশ লুটিয়ে পড়ে তার পায়ে। পাষাণ হৃদয়ও মুহূর্তে বিগলিত হয়ে যায়। সেখান থেকেও তখন উৎসরিত হয় প্রেম ও বিশ্বাসের স্বচ্ছ সুনির্মল ঝর্ণাধারা। কেননা প্রেম এক মিলনাত্মক শক্তি। অতীতের মত আজো পৃথিবীর যাবতীয় বিপদ ও সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, ইখলাস ও আধ্যাত্মিকতা এবং নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও মানবসেবা।

এই পূর্ববঙ্গেও অনেক অলী-দরবেশ ও জীর্ণ বস্ত্রধারী অনেক আল্লাহপ্রেমিক এসেছিলেন। শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যের যাতাকলে নিষ্পেষিত আদম সন্তানদের ভালবেসে তারা বুকে তুলে নিয়েছিলেন। এদেশের স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা আদম সন্তানদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। একদল হল মানুষ, আরেকদল হল সেসব হতভাগা আদম সন্তান, যাদের সাথে যে কোন ধরনের পাশবিক আচরণই ছিল পুণ্যের কাজ। বস্তুত পশুর চেয়েও নিচে ছিল তাদের সামাজিক অবস্থান। কুকুরের স্পর্শে মানুষ অপবিত্র হত না, কিন্তু অস্পৃশ্য আদম সন্তানদের ছায়া মাড়ালেও স্নান করে পবিত্র হতে হত। সে অধঃপতিত আদম সন্তানদের কাছে আল্লাহ প্রেমিক বান্দারা এসেছিলেন ইসলামের পয়গাম নিয়ে। তাওহীদের বাণী নিয়ে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের বার্তা বহন করে।

- সমাপ্ত -